পাকিস্তানের বিচার

"Pakistan is against the spirit of Islam. It cannot be said that one part of a country where the Muslims happen to be in a majority is Pak (pure) and other part where they are in minority is Napak (impure)."

—MAULANA ABUL KALAM AZAD.

রেজাউল করীম এম. এ., বি. এল

প্রণীত

বুক কোম্পানী লিমিটেড

কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

[মূল্য ১৷৵ টাকা

প্রকাশক—
দি বুক কোম্পানী লিঃ
৪।৩ বি, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
১৯৪২

মুদ্রাকর—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, বি-এ
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

ভূমিকা

পাকিস্থানের সপক্ষে ও বিপক্ষে বহু আলোচনা হইয়াছে। এ বিষয়ে নিরপেক্ষ আলোচনা করিবার জন্য এই পুস্তকের অবতারণা। ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

ভবিষ্যতে কোন দিন পাকিস্থান পরিকল্পনা বাস্তব রূপ ধারণ করিবে কি না বলিতে পারি না। ইহা গৃহীত হউক আর না হউক, ইহার অন্তর্নিহিত ত্রুটি ও অসুবিধাগুলি কোন মতেই অবহেলা করা যায় না। সুতরাং পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। সাধারণ মুসলমানের নিকট পাকিস্থান নামের একটা মোহ আছে। তাহারা কোন কিছু বিবেচনা না করিয়া কেবল হুজুগে পড়িয়া ইহাকে গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ দেখাইতেছে। কিন্তু এইভাবে হুজুগে মাতিয়া কোন জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা চলে না। পাকিস্থান পরিকল্পনা কোন স্থির মস্তিষ্ক হইতে বাহির হয় নাই। যে ভেদনীতি আজ কয়েকযুগ হইতে নীরবে কাজ করিয়া যাইতেছে, ইহা তাহারই চরমতম পরিণতি। পাঞ্জাবের মিঃ রহমত আলি সর্ব্বপ্রথমে ভারত-ব্যবচ্ছেদের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও কাশ্মীর এই কয়েকটি অঞ্চলকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি একটি স্বতন্ত্র

রাষ্ট্র গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি এই নব রাজ্যের নাম দিয়াছিলেন পাকিস্থান বা পবিত্রস্থান। ভারতের অপরাপর অঞ্চলকে তিনি বিভক্ত করিতে চাহেন নাই। মিঃ রহমত আলির এই পরিকল্পনা হইতে ইঙ্গিত পাইয়া পরে নানা জনে নানা ভাবে ভারত-ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা করিতে লাগিলেন। ডাঃ লতিফ,সার সেকেন্দার প্রমুখ নেতাগণ নিজ নিজ স্কীম জনসাধারণে প্রচার করিলেন। অবশেষে মুসলিম লীগের লাহোর ও মাদ্রাজ অধিবেশনে ভারত-ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইয়া গেল। লীগের প্রস্তাব এত অস্পষ্ট যে, তাহা নানা অর্থে গৃহীত হইতে পারে। তখন পর্য্যন্ত ইহার নাম-করণ পাকিস্থান হয় নাই। উক্ত স্কীমের বিরুদ্ধবাদিগণ ইহাকে পাকিস্থান নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। লীগওয়ালারাও অম্লানে এই নাম গ্রহণ করিয়া লইলেন। ব্রিটিশ সরকার যে এই ভেদনীতি-মূলক প্রস্তাব সমর্থন করিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে ইহাকে আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তদবধি পাকিস্থান আন্দোলন আরও জোরাল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, ইহার আর্থিক ও ,রাজনৈতিক দিকগুলি সূক্ষ্মভাবে দেখা দরকার। এই পুস্তকে এই সব বিষয় আলোচিত হইয়াছে। যদি ইহা পাঠে পাকিস্থান সম্বন্ধে মুসলমানগণের ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়, তাহা হইলে নিজ শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি—৩০শে বৈশাখ, ১৩৪৯ সাল।

রেজাউল করীম

উৎসর্গ

অখণ্ড ভারতের একনিষ্ঠ সেবক
অক্লান্ত কর্ম্মী ও আজন্ম মোজাহেদ
স্বাধীনতার জ্বলন্ত প্রতীক
উলামাকুলভূষণ

মৌলানা মনিরুজ্জমান ইস্‌লামবাদী

সাহেবের নামে এই পুস্তকটি
উৎসর্গ করিলাম

রেজাউল করীম

সূচী



পাকিস্তানের বিচার

ভারত ব্যবচ্ছেদের গোড়ার কথা

ভারত ব্যবচ্ছেদ বা পাকিস্থান আন্দোলনের গোড়ার কথা জানিতে হইলে পঁইত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তত্ত্বকথা অবগত হওয়া দরকার। কারণ দুইটি আন্দোলন একই পরিকল্পনার অন্তর্গত। একই আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া এই দুই আন্দোলনের উৎপত্তি। বর্ত্তমান পাকিস্থান পরিকল্পনা বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা হইতে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। সে যুগে যে উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, এ যুগের ভারত ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনার মধ্যে সেই উদ্দেশ্য নিহিত আছে। পার্থক্য এই যে, তখন ব্রিটিশ সরকার নিজেই অগ্রণী হইয়া বঙ্গভঙ্গের আদেশ দিয়াছিলেন। আর এ যুগে ভারত ব্যবচ্ছেদের দাবী করিতেছেন এ দেশেরই একদল লোক যাঁহারা সাধারণতঃ সরকার-পূজক বলিয়া পরিচিত। এতদ্ব্যতীত উভয় পরিকল্পনার মধ্যে নীতিগত কোন পার্থক্য নাই। কর্ত্তৃপক্ষ ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাদের কেহ এ প্রস্তাব করিলে তাহা দেশের কেহই শুনিবে না। তাই

তাঁহাদের নৈতিক সমর্থন লইয়া মুসলিম লীগ মুসলিম স্বার্থের নামে ভারত ব্যবচ্ছেদের দাবী করিয়া বসিল। ইহাতে দুইটি উদ্দেশ্য সফল হইবে। প্রথমতঃ একদল মুসলমান দেশের সর্ব্বত্রে ভারত ব্যবচ্ছেদের দাবী করিয়া আন্দোলন করিতে থাকিবে এবং মুসলমানদের দেখাদেখি অন্যান্য মাইনরিটি সম্প্রদায় তাহাদের জন্য একটা অংশ দাবী করিবে, তাহাতে সর্ব্বভারতীয় সংহতি ও জাতীয়তার আদর্শ ব্যাহত হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ এই আন্দোলনের জন্য কেহই ব্রিটিশ সরকারকে দায়ী করিবে না। তাঁহারা ত ইহার সহিত জড়িত নহেন। মেজরিটিদের অত্যাচারে মাইনরিটিগণ বাধ্য হইয়া ভারত ব্যবচ্ছেদের দাবী করিতেছে—ইহা তাঁহারা চাহেন না, সমর্থনও করেন না। কিন্তু তাই বলিয়া মাইনরিটিদের স্বাধীন অধিকারে ত হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। সুতরাং নির্ব্বিবাদে ভারত ব্যবচ্ছেদের আন্দোলন চলিতে থাকিবে। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া বহু আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ হইয়াছে, কিন্তু ধন্যবাদ আমাদের ব্রিটিশ সরকারকে। এই সব আক্রমণের বেগ তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হয় নাই। তাঁহারা সকল দলের ঊর্দ্ধে থাকিয়া পরম কৌতূহলে ভারতবাসীর আত্মকলহের নাটকীয় দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতেছেন।

বিগত বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পর হইতে বর্ত্তমান পাকিস্থান আন্দোলনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ যুগ কাটিয়া গিয়াছে তাহাকে প্রস্তুতীকরণের যুগ বলা যাইতে পারে। এ দেশের সংহতি শক্তি নষ্ট করিবার জন্য একটার পর একটা করিয়া কয়েকটি ভেদনীতির মারণ অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদে মুসলমানকে প্রলোভন দেওয়া হইয়াছিল যে,

উহার দ্বারা তাহাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হইবে, তাহাতে তাহারাই হইবে সর্ব্বেসর্ব্বা। বহু শিক্ষিত ও সরল হৃদয় মুসলমান সেই ফাঁদে পতিত হইয়া বঙ্গ ব্যবচ্ছেদে সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের প্রবল চাপে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ ব্যবস্থা রহিত হইয়া গেল। ভেদনীতির ইহাই প্রথম পরাজয়। কিন্তু তারপরই অন্যভাবে ভেদনীতি অবলম্বিত হইল। আইন সভায় পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া হিন্দু মুসলমানকে আলাদা করিয়া দিবার ব্যবস্থা পাকাপাকি হইয়া গেল। ইহাতে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের কূটনীতি সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিল। ইহার পর পৃথক নির্ব্বাচন উঠাইয়া দিবার বহু চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল। তারপর ক্রমে ক্রমে আসিল ১৯৩৫ সনের নূতন শাসনতন্ত্র। কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে শাসনভার গ্রহণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ভেদনীতির ঈপ্সিত পরিণতি আরম্ভ হইল। কংগ্রেসী প্রদেশে মুসলিম নিপীড়নের কাহিনী আবিষ্কৃত হইল। প্রস্তুতীকরণের গতি তীব্রবেগে ছুটিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ডাক্তার লতিফ একটা পরিকল্পনা উদ্ভাবন করিয়া দেশের সর্ব্বত্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিলেন। অনেকে ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। অনেকে চিন্তিত হইয়া পড়িল। দেশের চারিদিকে আন্দোলন আরম্ভ হইল। কেহ গণতন্ত্রকে নিন্দা করিল, কেহ সমর্থন করিল, কেহ বলিল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পরস্পরে বিবাদ করা অপেক্ষা আলাদা হইয়া থাকাই শ্রেয়ঃ; ভেদ নীতির ক্রিয়া দেশের অন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তারপর স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ আর একটা স্কীম রচনা করিলেন। ইহার আদি ও মূলকথা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বণ্টন। এ পর্য্যন্ত

জিন্না সাহেব এই সব পরিকল্পনা লইয়া মাথা ঘামাইতে সময় পান নাই। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ছিল অন্য দিকে। তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন কংগ্রেস ও গণতন্ত্রের মূলচ্ছেদ করিবার জন্য। তাঁহার অক্লান্ত প্রচারের ফলে মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেস-বিদ্বেষ, হিন্দু-বিদ্বেষ ও গণতন্ত্র-বিদ্বেষ ছড়াইয়া পড়িল। এইভাবে পাকিস্থান পরিকল্পনাকে বিনা বিচারে গ্রহণ করিবার জন্য যখন একদল তাবেদার লোক সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হইয়া গেল—তাহাদের মানসিকতা হইতে স্বাধীন চিন্তার শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল, তখন এক শুভক্ষণ দেখিয়া জিন্না সাহেব ভারত ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা দেশবাসীর নিকট পেশ করিলেন। এতদিন বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দিক দিয়া যে সব কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে সকলে একত্র হইয়া একটি সুগঠিত পরিকল্পনা খাড়া করিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, বিগত ৩৫ বৎসর ধরিয়া ভেদনীতির বিভিন্ন ধারা যে সব পথে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা আজ একত্র মিলিত হইল মিঃ জিন্নার পাকিস্থান পরিকল্পনার মধ্যে। ১৯০৫ সালে ঢাকায় যে বীজ উপ্ত হয়, তাহা নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর ,১৯৪০ সালে লাহোরে একটি প্রকাণ্ড বিষবৃক্ষের আকার ধারণ করিল। ইতিপূর্ব্বে ভেদনীতিমূলক যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, একটি অপরটির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। বঙ্গ-ভঙ্গ, পৃথক নির্ব্বাচন, গোবধ, মসজিদের সম্মুখে বাদ্যভাণ্ড, আসন ও চাকরী সমস্যা, 'পদ্ম ও শ্রী', 'বন্দেমাতরম্', 'বিদ্যামন্দির', কংগ্রেসী প্রদেশে মুসলিম নিপীড়নের কাহিনী, খাকসার আন্দোলন, সিয়া-সুন্নি বিবাদ—এই সব একই পলিসির

বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। আর এই সব আন্দোলন যখন মুসলমানের মানসিকতাকে সম্পূর্ণরূপে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া তুলিল, প্রতিবাদ করিবার মত শক্তি যখন একেবারেই লোপ পাইল—তখনই এবং কেবলমাত্র তখনই জিন্না সাহেবের ভারত ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা রচিত হইল—প্রচারিত হইল—এবং বহুস্থানে সমর্থিতও হইল। পাকিস্থান পরিকল্পনার ইহাই আদি ও গোড়ার কথা। যাঁহারা বিগত ৩৫ বৎসরের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন,—সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য লইয়া প্রথম ভেদনীতির কৌশল রচিত হইয়াছিল। ইহার জন্য কর্তৃপক্ষের উপর রাগ করিবার বিশেষ কারণ নাই। দুঃখ হয়, রাগ হয়—এদেশের কতকগুলি তথাকথিত নেতাদের উপর যাঁহারা জানিয়া শুনিয়া এবং সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করিয়াও সেই ভেদনীতির দাস হইয়া পড়িয়াছেন।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, ভারত ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনাটা বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনার অন্য সংস্করণ। সুতরাং উভয়েরই উদ্দেশ্য যে এক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের যুগে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা যে কথাটি বলিয়াছিলেন, তাহা আজিও বর্ণে বর্ণে খাটিয়া যায়। উক্ত পত্রিকা বঙ্গ ভঙ্গের কারণ প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

"The objects of the partition of Bengal are firstly to destroy the collective power of Bengali people, secondly to overthrow the political ascendency of Calcutta and thirdly to foster in Eastern Bengal the growth of a Moslem power which it is hoped will have

the effect of keeping in check the rapidly growing strength of the educated Hindu Community."

অর্থাৎ—বঙ্গ ভঙ্গের প্রথম উদ্দেশ্য বাঙ্গালী জাতির সমষ্টিগত শক্তি বিনষ্ট করা, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কলিকাতার রাজনৈতিক প্রাধান্য ধ্বংস করা এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য পূর্ব্ব বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে এমন একটা স্বতন্ত্র শক্তিবোধ জাগাইয়া দেওয়া—যাহা ক্রমবর্দ্ধমান হিন্দুদের শক্তিকে বাধা দিতে সক্ষম হইবে। বর্ত্তমান পরিকল্পনার ক্ষেত্র আরও বড়—একটা প্রদেশের নহে—ইহা সমগ্র ভারতের সংহতি শক্তি নষ্ট করিতে সহায়তা করিবে, বড় বড় প্রদেশের রাজনৈতিক গুরুত্ব নষ্ট করিবে এবং মুসলমানদের মধ্যে এমন একটা সর্ব্বনাশী স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করিবে যাহার কারণে মুসলমান সর্ব্বভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হইবে না এবং কংগ্রেসের প্রতেক উদ্যমকে বাধা দিবে। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময় সত্যি সত্যি এক দল মুসলমান দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়া এবং সাময়িক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সরকারী পরিকল্পনাকে সমর্থন করিয়াছিল। এমন একটি শিক্ষিত মুসলিম দল গঠিত হইল যাহারা প্রত্যেক ব্যাপারে জাতীয় আদর্শের বিরোধিতা করিয়াছিল। আজিও তাহাই হইতে চলিয়াছে। আজ একদল মুসলমান পাকিস্থান পরিকল্পনার মোহে এমন বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন যে, যাঁহারা ইহার ভিতরের গলদটা একদম লক্ষ্য করিতেছেন না। তা না করুন, কিন্তু এমন এক দুর্দ্দিন আসিবে যখন তাঁহারা দেখিবেন তাঁহাদের সুদিনের বন্ধুরা সামান্যমাত্রও সাহায্য করিবেন না। বঙ্গ-ভঙ্গের একটা প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানকে একটা স্বতন্ত্র প্রদেশের প্রভুত্ব প্রদান করা। তাহা দেওয়াও

হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের চোটে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হইয়া বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করিয়াছিলেন। তখন কিন্তু তাঁহারা মুসলমানের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। যাহারা সরকারকে এত সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদের কথা বিস্মৃত হইতে বিলম্ব হয় নাই। বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করার কারণে মুসলমানগণও প্রতিবাদ করিয়াছিল, কিন্তু সে প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয় নাই। পাকিস্থানের বেলায়ও তাহাই হইবে। আজ হয় ত অনেকে স্বতন্ত্র মুসলিম রাজ্যের স্বপ্নে নিমগ্ন। এই কল্পনা সাম্রাজ্যবাদের কাজে লাগিতেছে। তাই তাঁহারা নীরবে ইহা সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু যখন আর ইহা কোন কাজে আসিবে না, তখন কেহই তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না। তখন হয়ত কেহই মুসলিম স্বার্থের অস্তিত্বই স্বীকার করিবে না। সেই জন্য আমরা মুসলমানকে পূর্ব্বাহ্নে সাবধান হইতে বলি। এমন কাজ করিও না, এমন ব্যবহার করিও না, যাহাতে দেশের সংহতি শক্তি নষ্ট হইয়া পড়ে, অথবা স্বাধীনতা সংগ্রাম পিছাইয়া পড়ে। পাকিস্থান পরিকল্পনার দ্বারা মুসলমান একটুও লাভবান হইবে না—লাভবান হইবে সাম্রাজ্যবাদ। এতটুকু বোধ যদি আমাদের না থাকে, তাহা হইলে কোন পরিকল্পনাই মুসলমানকে জীয়াইয়া রাখিতে পারিবে না।

'পাকিস্থান না গোলামস্থান' ?

পাকিস্থানের সপক্ষে বিপক্ষে অনেক আলোচনা হইতেছে। কিন্তু কেহ কি একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন, ইহার শেষ পরিণতি কি ? পাকিস্থানের প্রত্যেকটি ধারা এবং ইহার সপক্ষে প্রত্যেকটি যুক্তি তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, পাকিস্থানের শেষ পরিণতি গোলামস্থান ব্যতীত আর কিছুই নহে। পাকিস্থানের দাবী কেন করা হইতেছে ? ভারতের স্বাধীনতার জন্য ? না, তাহা নহে। বৃটিশ সরকারের ছায়া-শীতল আওতা হইতে ভারতীয় মুসলমানকে মুক্ত করিবার জন্য ? না, তাহাও নহে। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য বৃটিশ সরকারের দুয়ারে ধর্ণা দিয়া ভারতবর্ষকে দ্বিধা বিভক্ত করিবার জন্য মুসলিম জনমত সৃষ্টি করা। হিন্দুরা অবিশ্বাস্য, তাই তাহাদের সহযোগিতায় লীগওয়ালারা কিছুই করিতে সম্মত নহেন। কিন্তু নিজেদের শক্তিতে ভারতবর্ষকে এমন কি পরিকল্পিত পাকিস্থানকে স্বাধীন করিবার কল্পনা তাঁহাদের কাহারও মনে জাগে না। বিদেশী অপেক্ষা এদেশীয় হিন্দুগণই তাঁহাদের নিকট অধিকতর ভীতির ও অধিকতর ক্ষতির কারণ—এই ভাবটা তাঁহাদের মনে প্রবল। আজ অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পাকিস্থানের মোহে এক শ্রেণীর মুসলমান দেশের কথা, দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা একদমই ভাবিতেছেন না। ভাবিতেছেন শুধু হিন্দুদের দ্বারা মুসলিম নির্য্যাতনের কথা, তাহাদের হাত হইতে মুসলমানকে বাঁচাইবার কথা। দেশের অন্ন-সমস্যার কি প্রকারে সমাধান হইবে,—বৈদেশিক

আধিপত্যের কি প্রকারে অবসান হইবে,—দেশ-শোষণের পথ কি ভাবে বন্ধ হইবে,—এ সব বিষয় তাঁহাদের নিকট অতি নগণ্য। পাকিস্থানের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হিন্দুরাও ত হিন্দু-রাজের কথা ভাবিতে পারে। একদিকে চলুক পাকিস্থান আন্দোলন, আর অন্য দিকে চলুক হিন্দু-রাজের প্রচার-কার্য্য। বেশ মজা হইবে। এইভাবে দেশের স্বাধীনতার কথা লোকে ভুলিয়া যাইবে এবং সমস্ত শক্তি এই প্রকার সর্ব্বনাশকর সাম্প্রদায়িকতার উপর নিবদ্ধ হইবে। পাকিস্থান-আন্দোলনের ফলে পাকিস্থান ত হইবেই না—হইবে গোলামস্থান। স্বাধীনতার আদর্শ হইতে দেশের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড়িবে এবং তাহার ফলে সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন কিছুদিনের জন্য ব্যাহত হইয়া যাইবে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থাটা আজ কোন স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ? মুসলমান আজ পাকিস্থানের নামে পাগল, আর হিন্দুরা তাহার বিরোধিতা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। দেশের সমস্ত অসাম্প্রদায়িক দল ও আন্দোলন আজ 'লিকুইডেশনে' যাইতে বসিয়াছে। সাম্প্রদায়িক দল ও উপদলগুলি আজ উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—দিনে দিনে তাহাদের প্রসার প্রতিপত্তি দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। মুসলিম লীগ ত আগেই জাগিয়াছে। এতদিনের ঘুমন্ত হিন্দু মহাসভা গা ঝাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে সামলাইতে যাইবে ? গালাগালি, বাদপ্রতিবাদ, বিবৃতির ছড়া-ছড়ি—এই সবই আজ দেশের একমাত্র উপভোগ্য বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। মুসলিম লীগ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—পাকিস্থান ব্যতীত কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবে না ; হিন্দু মহাসভা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—কিছুতেই ভারত বণ্টন হইতে দিব না। এই

পরস্পর-বিরোধী দাবী কেমন করিয়া উভয় সম্প্রদায়কে তুষ্ট করিবে ? কেমন করিয়া ইহা সফলতা লাভ করিবে ? কে এমন মহাপুরুষ আছেন যিনি দুই দলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিবেন ? কেন বৃটিশ সরকার ত মুরব্বির মত আমাদের সকল কাজই তদারক করেন, তাঁহারাই এই বিবাদ মিটাইয়া দিবেন। হয়ত তাঁহারাই মিটাইয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যস্থতায় যাহা হইবে, তাহা কথামালা বর্ণিত বানরের পিঠা ভাগের মতই হইবে। অবশিষ্ট সুবিধাগুলি শেষ পর্য্যন্ত সংরক্ষিত বিভাগের মধ্যে আশ্রয় লইয়া ভারতে বৃটিশ সরকারের বিজয় বৈজয়ন্তী চির উড্ডীয়মান রহিবে। সুতরাং পাকিস্থানের শেষ পরিণতি গোলামস্থান ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পাকিস্থানের প্রধান উদ্দেশ্যটা কি ? উত্তরে হয় ত বলা হইবে, ভারতের জটিল সাম্প্রদায়িক সমস্যার চিরসমাধান করা। কারণ, লীগ-ওয়ালাদের মতে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের প্রতি এরূপ শত্রুভাবাপন্ন যে একই দেশে একই শাসনাধীনে তাহাদের বাস করা চলিবে না। তাই চাই হিন্দুর জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, আর মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। কিন্তু পাকিস্থানের সমর্থনে সে সব স্কীম বা পরিকল্পনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এমন কোন ব্যবস্থা নাই, যাহার ফলে হিন্দু রাষ্ট্র হইবে একেবারে মুসলমান শূন্য, অথবা মুসলিম রাষ্ট্র হইবে একদম হিন্দু শূন্য। অধিবাসী বিনিময় তাঁহারা চান না। সুতরাং হিন্দু ভারতে যেমন মুসলমান থাকিবে, সেইরূপ মুসলিম-ভারতেও হিন্দু থাকিবে। হিন্দু-ভারতে মুসলমান রহিবে মাইনরিটি হইয়া এবং মুসলিম-ভারতে হিন্দুরা রহিবে মাইনরিটি হইয়া। সুতরাং পাকিস্থান পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত ব্যবচ্ছেদ হইয়া গেলেও পুরামাত্রায় মাইনরিটি সংরক্ষণ নীতি অব্যাহত

থাকিবে। মাইনরিটিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, আসন সংরক্ষণ, পৃথক নির্ব্বাচন সবই অব্যাহত থাকিবে। ইহাই যদি হয়—তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে পাকিস্থান রাষ্ট্রের পার্থক্য থাকিল কোথায় ? এখনও ত প্রত্যেক প্রদেশে মাইনরিটী সংরক্ষণ নীতি অক্ষুণ্ণ আছে। এখন যদি মাইনরিটিদের প্রতি অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তখনও সেই প্রকার অত্যাচার হইতে থাকিবে। মাইনরিটিকে স্বার্থরক্ষার জন্য তখনও চীৎকার করিতে হইবে। এখন অপেক্ষা পাকিস্থান পরিকল্পনায় মুসলমানের বেশী সুবিধা কেমন করিয়া হইবে ? মুসলিম প্রধান প্রদেশে হিন্দুদেরকে থাকিতে দিলে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সকল সময়ই যে মুসলিম প্রাধান্য থাকিবে, তেমন কোন নিশ্চয়তা নাই। সেইরূপ হিন্দু প্রধান দেশে সব সময়ই যে হিন্দু প্রাধান্য অব্যাহত থাকিবে, তেমন কোন কারণ নাই। এমন কোন আইন থাকিতে পারে না, যাহার ফলে পাকিস্থানে হিন্দুরা কতকগুলি মুসলমানকে লইয়া দল গঠন করিতে পারিবে না। মুসলমানগণই যে সব সময় একই দলভুক্ত হইয়া থাকিবে, সেরূপ নিশ্চয়তাও কেহ দিতে পারে না। যদি পাকিস্থানে কংগ্রেসের মত সকল সম্প্রদায়ের লোক লইয়া একটা অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং যদি হিন্দুগণ সেই দলে প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহারাই ত শাসনকার্য্য চালাইবে। এরূপ হইলে পাকিস্থানের সার্থকতা থাকিবে কোথায় ? এইভাবে প্রত্যেকটি মুসলিম প্রধান অঞ্চল যদি একসুরে পাকিস্থানকে রদ বা বাতিল করিতে চাহে, তখন কি হইবে ? সবই ত ভোটের ব্যাপার। আজ ভোটের জোরে পাকিস্থান চাহিতেছে। সেদিনও ত সেই ভোটের জোরে পাকিস্থান বাতিলের দাবী করিতে পারে। তখন কি হইবে ? পাকিস্থান পাইয়াও

কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা "খতম" হইয়া যাইতে পারে। এমন কি আবার সকল প্রদেশ অখণ্ড ভারতের অধীনে আসিতে পারে। পাকিস্থানে একটি মাত্র হিন্দু অথবা অন্য কোন অমুসলমান থাকিলে তাহার কোন মূল্য নাই। অতএব পরিষ্কারভাবে দেখা গেল, পাকিস্থান সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না, এবং উহাও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। মাইনরিটিগণ অখণ্ড ভারতে আজ যে সব সুবিধা পাইতেছে, পাকিস্থানে তাহার চেয়ে অধিক সুবিধা পাইবে না। তবে কোন সুখে লোকে নিখিল ভারতীয় পরিবেষ্টন পরিত্যাগ করিয়া পাকিস্থানের মত অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিতে যাইবে? হিন্দুপ্রধান প্রদেশে যে সব মুসলমান থাকিতে বাধ্য হইবে, তাহারাই বা বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর কি সুবিধা পাইবার আশা করিতে পারে? আর কাগজে-কলমে যদি কিছু সুবিধা দিয়াই থাকে, তবে তাহাকে কার্য্যকরী করিবার কি ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে? আজ যদি হিন্দুরা অবিশ্বাস্য হয়, তবে সেদিনও যে হইবে না তাহার কি নিশ্চয়তা থাকিবে? লীগওয়ালারা প্রতিশোধ লইবার কথা বলিতে পারেন। অর্থাৎ হিন্দু প্রধান দেশে মুসলমানদের উপর অত্যাচার হইলে পাকিস্থানের মুসলমানগণ হিন্দুদের উপর সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পারেন। কিন্তু এই যুক্তি অসার; ইহা প্রতিহিংসামূলক এবং ইহা দেশের শান্তির পক্ষে বিঘ্নকর। তাছাড়া অন্য দেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার হইবে, এই ভয়ে হিন্দুরা নিজের রাষ্ট্রের মুসলমানের উপর কেন অত্যাচার করিতে যাইবে? সেইরূপ মুসলমানগণও অন্য দেশের মুসলমানদের মর্ম্ম ব্যথায় কাতর হইয়া বিনা কারণে নিজেদের পাকিস্থানে হিন্দুর উপরই বা কেন অত্যাচার

করিবে? সুতরাং যদি অত্যাচারই হয়, তবে তাহা হইবে একতরফা। প্রতিশোধ লইয়া অত্যাচার বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে গেলে কোন অঞ্চল হইতে অত্যাচার কমিবে না। বরং নূতন নূতন সমস্যা বাড়িয়া যাইবে। আর যদি বাড়িতেই থাকে, তবে পাকিস্থানের উপযোগিতা কোথায় থাকিল?

লীগওয়ালারা আর একটা কথা বলিয়া থাকেন। পাকিস্থানে মুসলমানগণ ইসলাম ধর্ম্ম অনুযায়ী আইন রচনা করিবার সুযোগ পাইবে। তাহারা তাহাদের নিজস্ব সুবিধা, প্রয়োজন ও আদর্শ অনুসারে রাষ্ট্র গঠন করিতে সচেষ্ট হইবে। কিন্তু পাকিস্থানে অমুসলমান থাকিলে তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? তাহারা এরূপ পক্ষপাতমূলক আইন রচনা করিতে বাধা দিবে—হয়ত হইতেই দিবে না। আর যদি সেরূপ সম্ভব হয়, তবুও মাইনরিটিদের দিকেও তাকাইতে হইবে। তাহারাও ত তাহাদের নিজের ধর্ম্ম ও আদর্শ অনুসারে আইন রচনা করিতে চাহিবে। তাহারা তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিচারালয়, স্বতন্ত্র সুখ-সুবিধা চাহিতে থাকিবে। তাহাদের এই দাবী স্বীকার না করিলে অহরহঃ অশান্তির আগুন জ্বলিতে থাকিবে। আর তাহাদেরকে সুবিধা দিতে গেলে, অপরকেই "ক্যাপিচুলেশনের" (capitulation) মত একটা কিছু দিতে হইবে। প্রথমে আসিবে "ক্যাপিচুলেশন"; তাহারা হইবে "a state within a state." ইহার সোজা অর্থ—রাষ্ট্রীয় শক্তি ও প্রভুত্ব দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইবে। দীর্ঘকাল ধরিয়া তুরস্ক, মিশর, পারস্য প্রভৃতি দেশে যে ঘৃণিত "ক্যাপিচুলেশন" প্রথা বিদ্যমান ছিল এবং যাহা এই সব দেশের স্বাধীনতাকে পদে পদে ব্যাহত করিয়াছিল,

পাকিস্থানেও তাহাই হইতে থাকিবে। পাকিস্থান তখন মুসলমানের জন্য গলগ্রহ হইয়া পড়িবে। হিন্দু প্রাধান্য দূর করিতে গিয়া এমন এক সঙ্কটময় অবস্থা আসিয়া পড়িবে, যাহার প্রভাবে পাকিস্থানের মুসলমানের অবস্থা বিপ্লবের পূর্ব্বের তুরস্কের মত হইয়া পড়িবে। অন্য দিকে হিন্দু ভারতের হিন্দুগণও ত হিন্দু আদর্শে রাষ্ট্র গঠন করিতে চাহিবে। তাহারা সেই আর্য্য যুগের আদর্শ প্রবর্ত্তন করিতে চাহিবে। Equal Right of Citizenship যদি হিন্দু রাষ্ট্রে মুসলমানকে এবং মুসলিম রাষ্ট্রে হিন্দুকে না দেওয়া হয়, তবে হিন্দু ও মুসলমানগণ সমভাবেই চীৎকার করিতে থাকিবে। কোথাও শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকিবে না। কেমন করিয়া তাহাদের অসন্তোষ নিবারিত হইবে? কোনও প্রকার রুদ্রনীতি ইহা নিবারণ করিতে পারিবে না। অসন্তোষ দিন দিনই বাড়িয়াই চলিবে। পাকিস্থান কোন সমস্যারই সমাধান করিবে না,—সঙ্কট, গোলমাল ও অসন্তোষ সর্ব্বত্র বিরাজমান থাকিবে। এই সুযোগে বিদেশীগণ চিরকালই ভারতের বুকে প্রভুত্ব করিতে থাকিবেন; পাকিস্থান স্বাধীনতা আনিবে না—আনিবে গোলামস্থান।

অধিবাসী বিনিময়ের দিকটা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক। অধিবাসী বিনিময় শুধু যে অসম্ভব তাহা নহে, ইহা অকল্পনীয়, অবাস্তব ও ক্ষতিকর বলিয়া প্রতিভাত হইবে। ইহার দ্বারাও কোন সমস্যার সত্যিকারের সমাধান হইবে না। ঘর বাড়ী, বিষয় সম্পত্তি, এসব হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব হইবে না। সম্পত্তি বণ্টন, অন্যান্য বস্তুর আদান প্রদান, নূতন স্থানে নূতন ঘর বাড়ি নির্ম্মাণ, নূতন দেশের আবহাওয়া পারিস্থিতি, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও রীতিনীতির সহিত খাপ খাওয়ান

এই সব ব্যাপারে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। এত সব অসুবিধা স্বীকার করিয়াও যদি অধিবাসী বিনিময় হইয়া যায়, তাহা হইলেও নূতন নূতন সমস্যা আসিয়া দেখা দিবে। তার পর ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে আবার অন্যান্য দেশ হইতে বিশেষতঃ হিন্দু রাষ্ট্র হইতে বহু লোক পাকিস্থানে আসিয়া পড়িবে। মুসলমানের মূলধন যে খুবই কম তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মূলধনের জন্য বিদেশী হিন্দুর সাহায্য লইতে হইবে। এইভাবে কয়েক যুগের পর দেখা যাইবে, অত সাধের হিন্দু-শূন্য পাকিস্থান আবার "কুফরস্থান" (অমুসলমান) হইয়া যাইবে। তখন আবার সেই মাইনরিটি সমস্যা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। মাইনরিটি স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া আবার চক্র ঘুরিতে থাকিবে। মাইনরিটিদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইবে,—তাহাদের রক্ষার জন্য আবার সেই সংরক্ষণনীতি, সেই Capitulation, সেই state within a state—সবই আসিয়া পড়িবে। ফলে পাকিস্থানের শান্তি পদে পদে ব্যাহত হইতে থাকিবে। স্বাধীন পাকিস্থান চির পদানত হইয়া রহিবে। তাই বলিতেছিলাম, পাকিস্থান গোলামস্থানের নামান্তর মাত্র।

পাকিস্থান কবে হইবে, তাহা জানি না। কিন্তু ইহাকে কেন্দ্র করিয়া যে আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর তাহার ঘোরতর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। পাকিস্থানের নেতাগণ স্বাধীনতার আগে পাকিস্থান চান—আর বিলাতের বড় কর্ত্তারা মধ্যস্থ হইয়া ভারতকে বণ্টন করিয়া দিবেন। তার পর স্বাধীনতা আন্দোলন যে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আজ হিন্দু ও মুসলমান যুক্তভাবে সংগ্রাম করিয়া আমরা কিছুই করিতে পারিতেছি না। সেদিন পৃথকভাবে

সংগ্রাম করিয়া আমরা কি করিতে পারিব? তাছাড়া পাকিস্থানের জন্য মুসলমানগণ বৃটিশ সরকারের নিকট এরূপ কৃতজ্ঞ রহিবে যে, তাহারা বৃটেনের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিবে না। কৃতজ্ঞতার একটা মূল্য আছে। পাকিস্থানের মাইনরিটি রক্ষার নামে বৃটিশ সরকার পদে পদে দেশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবে। গবর্ণরগণ নিজেদের হাতে বিশেষ ক্ষমতা সংরক্ষিত করিয়া রাখিবেন। পাকিস্থান শেষ পর্য্যন্ত দেশকে গোলামস্থান না করিয়া ছাড়িবে না। পাকিস্থানের অসুবিধার কথা বিশেষতঃ অধিবাসী বিনিময়ের অসুবিধার কথা আমাদের নেতারা ভাল করিয়া জানেন, তাই তাঁহারা পরিষ্কার করিয়া কোন কথা বলিতে চাহেন না। সবই অস্পষ্ট ও গোঁজামিল। এই গোঁজামিলের উদ্দেশ্য কি? যদি সব কথা আজ স্পষ্ট করিয়া বলেন, তবে ইহার সমর্থনে একটাও মুসলমানও পাওয়া যাইবে না। তাহারা সরাসরি ইহা প্রত্যাখ্যান করিবে। অন্য পরে কা কথা, স্বয়ং মাননীয় মৌলবী ফজলুল হক সাহেব পাকিস্থান বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া মিঃ জিন্নাকে জানাইয়াছিলেন। সাধারণ লোক ভাবপ্রবণ, তাহারা এই অস্পষ্ট কথা শুনিয়া মনে করিতেছে, হয়ত ভারতে মুসলিম্-রাজ হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহার ভিতরে তলাইয়া প্রবেশ করে নাই। আর নেতারাও ইচ্ছা করিয়া সবই ধূম্রাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা অধিবাসী বিনিময় সম্বন্ধে একদম নীরব। কারণ এবিষয়ে কোন কথা বলিলে লোকে সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থানকে অসম্ভব বলিয়া অগ্রাহ্য করিবে। পাকিস্থান বৃটিশ পলিসির চরম সার্থকতা। কয়েক যুগ পূর্ব্বে পৃথক নির্ব্বাচনের দ্বারা যে ভেদনীতির বীজ উপ্ত হইয়াছিল, পাকিস্থান তাহারই চরম বিকাশ মাত্র।

্থক নির্ব্বাচন স্বাধীনতার আন্দোলনকে বাধা দিয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেশ কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে। তাহাদের এই যৎসামান্য অগ্রগতিকে প্রতিহত করিবার জন্যই পাকিস্থানের উৎপত্তি—সুতরাং পাকিস্থানের শেষ পরিণতি—ভারতের চিরদাসত্ব, পাকিস্থান গোলামস্থান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পাকিস্থানের গোপন উদ্দেশ্য

একদল লোক আছেন, যাঁহারা কেবল নূতন নূতন পরিকল্পনা রচনা করিয়া দেশময় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে ভালবাসেন। পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবে কি না, আর কার্য্যকরী করিতে গেলে যে সাধনার প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের আছে কি না, তাহা কেহই বিবেচনা করিয়া দেখেন না। পরিকল্পনা দিয়া নিজেদের অযোগ্যতাকে গোপন করিবার দুরভিসন্ধি তাঁহাদেরকে এমনভাবে পাইয়া বসে যে, তাঁহারা হিতাহিত ভাবিবার অবসর পান না দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইবে, তাঁহাদের কথা লইয়া আলোচনা হইবে, কেহ নিন্দা করিবে, কেহ প্রশংসা করিবে—এইসব গণ্ডগোলের মধ্যে তাঁহারা বেশ একচোট নাম কিনিয়া লইবেন; এবং সহজেই তাঁহাদের অনুবর্ত্তীদের উপর নেতৃত্বটা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবেন। পাকিস্থান পরিকল্পনার রচকদের উদ্দেশ্য যে কতকটা এইরূপ তাহা আমরা বেশ উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু ইহা হইল বাহিরের দিক। পাকিস্থান পরিকল্পনার আরও কয়েকটি গোপন উদ্দেশ্য আছে, তাহা হয়তো সহজে সাধারণের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে না। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, আরও কতকগুলি গভীরতর অভিসন্ধির জন্য এই পাকিস্থান পরিকল্পনা জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। সময় ও সুযোগটার প্রতি সকলকে লক্ষ্য করিতে বলি। কংগ্রেস যখন গণ-পরিষদের দাবি করিতেছে, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের আয়োজন করিতেছে এবং সর্ব্বত্র সত্যাগ্রহ কমিটি প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, ঠিক

সেই সময় অন্য কাজ বাদ দিয়া পাকিস্থান পরিকল্পনার জন্য এত তোড়জোড় কেন? কংগ্রেসের কার্য্যক্রমের সহিত কি ইহার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই? পূর্ব্বে যখনই কংগ্রেস সংগ্রাম করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি পাণ্টা আন্দোলন আরম্ভ করিয়া কংগ্রেসের কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই পাকিস্থান আন্দোলনেও সেই একই উদ্দেশ্য সূচিত হইয়াছে। মুসলমানকে কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। "বন্দে মাতরম্", "বিদ্যামন্দির", কংগ্রেসী প্রদেশে মুসলিম নিপীড়নের কাহিনী—এইসব লইয়া কিছুদিন বেশ হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু মিথ্যার উপর কোন আন্দোলনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, তাই এগুলি অতি শীঘ্র পুরাতন হইয়া গেল। সাধারণ মুসলমান যখন বুঝিল যে, অনর্থক বাজে বিষয় লইয়া তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে, তখন একটা নূতন কিছু না দিলে, তাহাদিগকে আর হাতে রাখা যাইবে না। সেইজন্য সাম্প্রদায়িকতাকে নূতন রূপ দিবার জন্য জাতীয় সংগ্রামের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পাকিস্থান পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হইয়াছে। আমরা একথা ভবিষ্যৎ বাণীর মত বলিতে পারি যে, এই আন্দোলন যখন পুরাতন হইয়া যাইবে, তখন লীগওয়ালারা অন্য একটা কৌশল আবিষ্কার করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। জাতীয়তার সহিত সাম্প্রদায়িকতার কোন আপোষ নাই। সাম্প্রদায়িক নেতারা একটা না একটা ছল উদ্ভাবন করিয়া জাতীয়তার টুঁটি চাপিয়া মারিতে সচেষ্ট হইবেন। এই অবস্থার একমাত্র প্রতিকার সাম্প্রদায়িকতাকে কোনক্রমেই প্রশ্রয় না দেওয়া।

পাকিস্থানের গোপন উদ্দেশ্যের কথা বলিতেছিলাম। ইহার প্রধান

উদ্দেশ্য হইল, কংগ্রেসের গণ-পরিষদের দাবির বিরুদ্ধে একটা সক্রিয় পাল্টা আন্দোলনকে জীবিত করিয়া রাখা। গণ-পরিষদের আদর্শ এমনি মনোমুগ্ধকর যে, জনসাধারণ যদি ইহার বিপুল সম্ভাবনার কথা একবার বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা ইহার জন্য পাগল হইয়া যাইবে, যেমন ফরাসী বিপ্লবের যুগের ফ্রান্সের জনসাধারণ হইয়াছিল। হয় ত তখন দেশের দিক হইতে গণ-পরিষদের দাবি হইতে থাকিবে। মুসলিম স্বার্থের দিক হইতে গণ-পরিষদের বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই। কারণ, কংগ্রেস মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্ব্বাচনের দাবি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে। তদুপরি মুসলিম স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলি মুসলমানদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানিয়া লইবার প্রতিশ্রুতি আছে। ইহার পর গণ-পরিষদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা চলে না। কিন্তু যেহেতু ব্রিটিশ সরকার গণ-পরিষদ চাহেন না, সেই হেতু মুসলমানের তরফ হইতে উহার বিরোধিতা করা চাই। তাই এই পাকিস্থান পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হইয়াছে ; যেন মুসলমান ইহার প্রলোভনে গণ-পরিষদের দাবিকে অগ্রাহ্য করিয়া দেয়। লীগপন্থীগণ যাহা আশা করিতেছিলেন তাহাই হইল। একদিন মুসলমান সত্য সত্যই গণ-পরিষদ অপেক্ষা পাকিস্থানকেই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতে লাগিল। পাকিস্থানের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—সীমান্ত প্রদেশে লীগ প্রভাব বিস্তার করা। মুসলিম লীগ শত চেষ্টা করিয়াও সীমান্ত প্রদেশে উহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এই মুসলিম প্রধান প্রদেশটি দৃঢ়ভাবে লীগের নেতৃত্ব অস্বীকার করিয়াছে এবং কংগ্রেসের অনুবর্ত্তী হইয়া স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। ইহাদের মধ্যে লীগ প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে এখানকার জনসাধারণের মধ্যে

মুসলিম-রাজের স্বপ্ন জাগাইয়া দিতে হইবে। একটা স্বাধীন মুসলিম রাজ্য গঠিত হইবে, যেখানে মুসলমানরাই হইবে সর্ব্বেসর্ব্বা, ইংরেজের প্রভাব থাকিবে না, সেই পূর্ব্বের মত আবার মুসলমানগণ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে স্বীয় বাস-ভূমে রাজত্ব করিবে। এই আদর্শে যদি সীমান্ত, পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশের মুসলমানগণ উন্মত্ত হইয়া উঠে, তবে সেখানে কংগ্রেসের তো পরাজয় হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে লীগের প্রভাব শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে। এই মহাসমরের সময় যদি এইসব সামরিক প্রধান দেশের লোক স্বাধীনতার কথা পরিত্যাগ করিয়া অহরহ পাকিস্থানের কথা ভাবিতে থাকে, তবে তাহাতে সাম্রাজ্যবাদেরও ষোল আনা লাভ হইবে। এই কারণেই মুসলিম লীগ উপযুক্ত সময়ে পাকিস্থান পরিকল্পনার আদর্শ মুসলমানের সম্মুখে প্রচার করিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে—কংগ্রেসের আসন্ন সংগ্রামকে ব্যাহত করিয়া দেওয়া। কংগ্রেস যে পাকিস্থান পরিকল্পনা সমর্থন করিবে না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। কংগ্রেসের এই আচরণ লইয়া মুসলমানদের মধ্যে সুকৌশলে প্রচারকার্য্য চালান হইবে। কয়েকটি মুসলিম প্রধান দেশে মুসলিম রাজ্য প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছিল, কংগ্রেস তাহাতে বাধা দিয়া মুসলমানের সব সাধ পণ্ড করিয়া দিল। এইপ্রকার প্রচার কার্য্য দ্বারা যদি মুসলমানের মানসিকতা বিষাক্ত করিয়া তুলা হয়, তবে কি তাহারা সংগ্রামে যোগদান করিতে পারে? যোগ দেওয়া ত দূরের কথা, তাহারা হয়তো সমস্ত শক্তি দিয়া বাধা দিবে। খাকসারগণ তো ইতিমধ্যেই মহড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। জাতীয় সংগ্রামের মুখে পাকিস্থান পরিকল্পনা যে সংগ্রামকে পণ্ড করিতে সাহায্য করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই পরিকল্পনার চতুর্থ উদ্দেশ্য আরও গুরুতর।

হিন্দুদের অনুভূতিতে আঘাত দিয়া তাহাদিগকে অধিকতর সাম্প্রদায়িক করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবে। এই অখণ্ড ভারত খণ্ডিত হইতে চলিয়াছে—ইহা দেখিয়া কোন হিন্দু স্থির থাকিতে পারিবে না। সুতরাং তাহারা পাল্টা আন্দোলন আরম্ভ করিবে। মুসলমানগণ ইহার উত্তর দিবে। এই ভাবে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চলিতে থাকিলে দেশের বহু লোক কিছুদিন সংগ্রাম ও স্বাধীনতার কথা আর তুলিবে না। তখন সাম্রাজ্যবাদের রথ ঘর্ঘর রবে চলিতে থাকিবে। আমরা যে আশঙ্কা করিতেছিলাম, ইতিপূর্ব্বে তাহাই ফলিতে লাগিয়াছে। পাকিস্থান দেশের সংহতি শক্তি নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক জাতীয়তাবাদীর কর্ত্তব্য সমস্ত শক্তি দিয়া ইহাকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া। এই দিক দিয়া আজাদ-মুসলিম সমিতির উদ্দেশ্য যে কতটা সফল হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিত।

ভারত বণ্টন ও মিষ্টার জিন্না

প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানগণের প্রতিনিধিস্বরূপ মিঃ জিন্না ভারত বণ্টনের যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা লইয়া দেশের চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। এরূপ সর্ব্বনাশী পরিকল্পনা যে প্রত্যেকের নিকট সরাসরি অগ্রাহ্য হইবে, তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ কথা। তবুও একদল মুসলমান উহাকে মনপ্রাণ দিয়া সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু আর একদল মুসলমান আছেন, যাঁহারা সাধারণতঃ জাতীয়তাবাদী বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা উক্ত পরিকল্পনাকে আত্মঘাতী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি উহাকে আশীর্ব্বাদ করেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জিন্না সাহেবের পরিকল্পনার সমর্থনকারীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। যে পরিকল্পনার সহিত কোটি কোটি লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ ও ভাগ্য ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িত তাহা কি মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের খামখেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য কোনওদিন বাস্তবরূপ ধারণ করিবে? মিঃ জিন্না ইহা কি জানেন না যে, দেশের কোন সম্প্রদায়ই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে না। চারিদিক হইতে ইহার প্রতিবাদ হইবে। এমন কি তাঁহার দলভুক্ত বহুলোকও ইহা সমর্থন করিতে ইতস্ততঃ করিবে। এত সব জানিয়া শুনিয়া কেন তিনি এই প্রকার সর্ব্বনাশকর ও আত্মঘাতী প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন? জিন্না সাহেবের বিগত কয়েক বৎসরের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিলেই ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে। আমরা তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের এক অধ্যায় আজ

পাঠকগণের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইব, জিন্না সাহেব কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ভারত-বণ্টনের প্রস্তাব করিতে সাহসী হইলেন। বর্তমান জিন্না পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেকার দেশপ্রেমিক জিন্না নহেন। যে জিন্না কংগ্রেস ও লীগের সভায় গণতন্ত্রের মহিমা গান গাহিতেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতিকে সুতীক্ষ্ণভাবে সমালোচনা করিতেন, এ জিন্না সে জিন্না নহেন। অসহযোগ আন্দোলনের পর যিনি সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহাদের ভেদনীতির দাস হইয়া পড়িয়াছেন, এ জিন্না সেই জিন্না। ভারতের হিতাহিত তাঁহার দৃষ্টিকোণের বাহিরে। মুসলমানের কল্যাণের সম্যক উপলব্ধি তাঁহার বুদ্ধি-বিবেচনার অতীত। এহেন ব্যক্তি যখন মুসলিম স্বার্থের নামে কোন পরিকল্পনা উপস্থিত করেন, তখন সম্ভবতঃ মনে সন্দেহ জাগে, ইহার ফলে সাম্রাজ্যবাদের কোন কারসাজি আছে কিনা? ভারতীয় ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদের কোন কারসাজি আছে কিনা তাহা জানিবার একটিমাত্র মানদণ্ড আছে; তাহা এই যে, কোন শ্রেণীর লোক তাহা সমর্থন করিতেছে? যদি দেখা যায়, দেশের নাইট-নবাব ও অন্যান্য উপাধিধারীগণ উহা সমর্থন করিতেছেন, ইংলণ্ডের রক্ষণদলের পত্রিকা ও নেতাগণ সেই সব ব্যাপারকে অনাবশ্যকভাবে গুরুত্ব প্রদান করিতেছেন, অথবা ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ প্রেস তাহা সমর্থন করিতেছে, তবে নিঃসন্দেহে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, উহা সাম্রাজ্যবাদের কারসাজি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই মানদণ্ডকে সামনে রাখিয়া আমরা জিন্না সাহেবের ভারত-বণ্টনের পরিকল্পনাটিকে বিচার করিলে কি দেখিতে পাইব? এদেশের নবাব, নাইট, ও আপকেওয়াস্তে নেতারা উহা সমর্থন করিয়াছেন। ভারতবন্ধু "ষ্টেটস্‌ম্যান"

উহার সমর্থনে এক লম্বা প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিয়াছেন এবং সংবাদের স্থানে চিত্তাকর্ষক হেডলাইন দিয়া উহার প্রতি দেশের লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন। বিলাতের রক্ষণশীল দলের নেতা ও মুখপত্রগুলিও মিঃ জিন্নার পরিকল্পনাকে প্রাণ ভরিয়া সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং আমরা যদি অনুমান করি যে, এই পরিকল্পনার মধ্যে এমন সব লোকের প্রভাব আছে, যাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ভারতবর্ষকে চিরপদানত করিয়া রাখা, তবে তাহা ভুল হইবে না, অথবা অযৌক্তিক হইবে না।

এই পরিকল্পনাটিকে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচনা করিব। এক্ষণে জিন্নাপন্থিগণকে একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব—ভারতে কি এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহার জন্য ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত না করিলে মুসলমানের আর বাস করা চলিবে না? পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মুসলিম লীগ যখন বিভিন্ন প্রদেশের আইন সভায় প্রার্থী খাড়া করিয়াছিল, তখন হইতে কি মুসলমানের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, ভারত-বণ্টন না হইলে তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করা চলিবে না? সে সময় মিঃ জিন্নার নির্দ্দেশে মুসলিম লীগ যে নির্ব্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করিয়াছিল, তৎপ্রতি দেশবাসী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সেই ইস্তাহারে ভারত-বণ্টনের নামগন্ধ ছিল না, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারও ছিল না, বরং তাহাতে স্পষ্টভাবে এই দাবী করা হইয়াছিল—

"that the present provincial constitution and proposed Central Constitution should be replaced by democratic full self-government." (The Musalman দ্রষ্টব্য)

অসংখ্য মুসলিম ভোটারদিগকে গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আজ কোন্ সাহসে লীগওয়ালারা ভারত-বণ্টনের জন্য মাতিয়া উঠিয়াছেন? ইহাতে কি ভোটারগণকে প্রতারিত করা হয় না? বর্ত্তমানে বিভিন্ন আইনসভায় মুসলিম লীগের যে সব সভ্য আছেন, নির্ব্বাচনী ইস্তাহারের বিরুদ্ধে তাঁহাদের যাইবার কোন অধিকার নাই। কিন্তু ধর্ম্মান্ধতা এমনি বস্তু যে, ইহার কবলে পড়িলে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। তাই আজ লীগওয়ালারা নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া আপন খেয়াল মত চলিতেছেন এবং ধর্ম্ম-বিপন্নের ধুয়া তুলিয়া গোটা সমাজকে প্রতারিত করিতেছেন। হায় মুসলমান সমাজ! কতদিন তুমি এইভাবে প্রতারিত হইবে? সে যাহা হউক, আইনসভায় নির্ব্বাচনের পর দেখা গেল যে, কয়েকটা প্রদেশ পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে মন্ত্রিত্ব গঠিত হইল। যেখানে মুসলিম লীগ মাইনরিটি, সেখানে মন্ত্রিমণ্ডলীতে তাঁহাদের প্রবেশ সুদূরপরাহত হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে পৃথক্ নির্ব্বাচনের দাবী করিয়া তাঁহারা এমন এক মারাত্মক ভুল করিয়া বসিয়াছেন যে,আজও তাহার সংশোধনের কোন উপায় নাই। সুতরাং বিরুদ্ধ দলে থাকা ব্যতীত তাঁহাদের কোন গত্যন্তর রহিল না। কিন্তু এত সহজে তাঁহারা পরাজয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাই আরম্ভ হইল গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ! তাই উদ্ভাবিত হইল মুসলিম পীড়নের কল্পিত কাহিনী! এত চীৎকার করিয়া কেহ যখন তাঁহাদের কথা শুনিল না, তখন তাঁহারা মনের ঝালে চরম পন্থা অবলম্বন করিতে চাহিলেন। কিন্তু ধামাধরা ও সরকার ঘেঁসা ব্যক্তিগণ কি চরম পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন? তাঁহারা যুদ্ধ করিতে পারিবেন না, ত্যাগ করিতে পারিবেন না, জেলে যাইতে

পারিবেন, না, অথচ চরম পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইঙ্গিত দিবার লোকের অভাব ছিল না। সেই ইঙ্গিতটুকু পাইয়া তাহাকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া একটা পরিকল্পনা উপস্থিত করিলেন। ইহাই হইতেছে ভারত-বণ্টনের পরিকল্পনা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এত বড় যে একটা পরিকল্পনা, যাহার সহিত কোটি কোটি লোকের ভাগ্য জড়িত, তাহা কোন গভীর ও মূল কারণের জন্য নহে। মুসলিম লীগের সদস্যগণ যে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলে স্থান পান নাই বা পরেও পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, এই কারণে জিন্না সাহেব ভারত-বণ্টনের প্রস্তাব করিয়া ফেলিলেন। কংগ্রেসী নেতারা নির্দ্দেশ দ্বারা দূর হইতে সাত-আটটা প্রদেশের শাসনভার পরিচালনা করিতেছেন, আর কেহই জিন্না সাহেবকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে না, এমন কি তাঁহার লীগের মন্ত্রীরাও না—ইহা কি মানুষ সহ্য করিতে পারে? এই "ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স" জিন্না সাহেবের পরিকল্পনায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ব্যক্তিগত কারণে গোটা সমাজকে প্রতারিত করিবার এমন উদাহরণ জগতে খুব কম দেখা যায়। কংগ্রেস যদি লীগের সদস্যকে মন্ত্রিত্বে স্থান দিতে স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে ভারত বণ্টনের পরিকল্পনার কোন অস্তিত্ব দেখা যাইত না—গোবধ বা বাদ্যভাণ্ডের জন্য কোন আন্দোলন হইত না; আর বিদ্যামন্দিরকে শিরোধার্য্য করিয়া লইবার জন্য লীগপন্থিগণই উপদেশ দিতেন। কিন্তু যাহা হইবার নহে, অথবা যাহা হয় নাই, তাহা লইয়া আলোচনা করিয়া লাভ নাই। একথা মুসলিম পাঠকগণকে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, তাঁহাদের সম্মুখে যে পরিকল্পনা উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা মুসলমানের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে।

মুসলিম ভারতের আশা তাঁহারা যত শীঘ্র পরিত্যাগ করেন, ততই তাঁহাদের লাভ হইবে। কতগুলি নেতার খামখেয়াল হইতে যাহা উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি—সকল দিক দিয়াই অবাঞ্ছনীয়, অনাবশ্যক ও আত্মঘাতী। হিন্দু হইতে পৃথক থাকিয়া আমাদের কোন লাভ নাই। হিন্দুর সহযোগিতা ও সাহায্য বৈদেশিক শক্তির সাহায্য অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয়ঃ ও বাঞ্ছনীয়। এই সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত করিয়া জিন্না সাহেব মুসলমান সমাজকে ধ্বংসের পথে আগাইয়া দিতেছেন। খোদার নিকট এই প্রার্থনা করি, মুসলমানের এতটুকু শুভবুদ্ধি হয়, যেন তাহারা লীগওয়ালাদের খপ্পরে গিয়া না পড়ে।

ভারতে জাতীয়তা গঠনে বাধা

ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিবার পরিকল্পনা রচনা করিয়া ডাক্তার লতিফ উহার সমর্থনে যে সব যুক্তি দিয়াছেন এইস্থলে তাহার আলোচনা করিব। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যে, জাতিত্বের (Race) দিক হইতে ভারত এক নহে,—এখানে বিভিন্ন ভাষা আছে, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, বিভিন্ন স্বার্থ ও সংস্কৃতি আছে, আর আছে বিভিন্ন জাতি (Race) এবং এই সকলের মধ্যে এরূপ মূলগত পার্থক্য আছে যে, এখানে কোনও দিন কোনও প্রকার সমন্বয়ের কথা চিন্তা করা যায় না। যতদিন ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় একসঙ্গে থাকিবে, ততদিনই তাহারা পরস্পর মারামারি করিবে, কোনওরূপ জাতীয় ঐক্য হইতে দিবে না। এই জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা হইতেছে—ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেওয়া। একটু পর্য্যবেক্ষণ সহকারে সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই প্রকার যুক্তি নিতান্ত অসার ও অবাস্তব। জাতিত্বের দিক হইতে যে সব জার্ম্মাণ এক ও অভিন্ন তাহাদিগকে একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে,এই অজুহাত দেখাইয়া হার হিটলার অধুনা এক নূতন ধূয়া তুলিয়াছেন ; এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়া কয়েকটি দেশের স্বাধীনতাকে হরণ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করিলেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হাজার হাজার, বৎসর পর এই প্রকার জাতিত্বের প্রশ্ন উত্থাপনের মূলে আছে সাম্রাজ্যবৃদ্ধির লালসা। বর্ত্তমানে কোন দেশকে জাতিত্বের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত করিবার

অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই ও থাকিতে পারে না। লীগপন্থীরা জাতিত্বের দিক হইতে মুসলমানকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করিতে গিয়া ঐতিহাসিক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রচারমূলক ধর্ম্ম ইসলাম যাহারা গ্রহণ করে তাহারাই মুসলমান। কিন্তু জাতিত্বের দিক হইতে সব মুসলমান একই জাতিভুক্ত নহে। অন্য পরে কা কথা, মৌলানা আকরম খাঁ, মিঃ জিন্না, সার মহম্মদ ইকবাল, মৌলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধি, খাজা কমালুদ্দিন প্রমুখ বড় বড় মুসলমান নেতা জাতিত্বের দিক হইতে আরব বংশসম্ভূত মুসলমানের সহিত এক নহেন। ইঁহাদের রক্তে এখনও হিন্দুর রক্ত প্রবাহিত। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, এইরূপ বহু মুসলমান আছেন যাঁহাদের দেহে আর্য্য ও অনার্য্য রক্তের সংমিশ্রণ আছে। সুতরাং ধর্ম্ম ও জাতিত্বের নামে দল গঠন করিতে গেলে সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধাই বেশী হইবে। তাই একজন লেখক বলিতেছেন :—

"The science of ethnology has revealed the difficulties of drawing the lines which seperate one race from another, since many existing races are mixed in character, that is they have no common origin, but have been formed by a fusion of various races."—(Garner—116).

অর্থাৎ—জাতিতত্ত্ব বিজ্ঞান দেখাইয়া দিয়াছে যে, দুই জাতির মধ্যে কোনও রূপে সুনির্দ্দিষ্ট সীমা রেখা টানিয়া দেওয়া খুবই কঠিন বিষয়। কারণ বর্ত্তমানে এমন বহু জাতি আছে যাহাদের মধ্যে বিভিন্ন রক্ত প্রবাহিত এবং নানা উৎপাদনের সংমিশ্রণে তাহারা গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতে কয়টি পরিবারে খাঁটি আরব রক্ত আছে তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং ভারতের

সমগ্র মুসলমানকে একজাতির অন্তর্ভুক্ত করিতে যাওয়া ভুল। এবং এই ভিত্তিতে ভারতকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দ্বিখণ্ডিত করিতে যাওয়া আরো ভুল।

প্রায় সাত শত বৎসর হইতে মুসলমান ভারতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে এদেশের অপরাপর অধিবাসীদের সহিত তাহাদের এরূপভাবে সংমিশ্রণ হইয়াছে যে, জাতিত্বের দিকে হইতে এদেশের আর্য্য-অনার্য্য হিন্দু-মুসলমানকে অনেকটা একই জাতির পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এদেশে ধর্ম্মের বিভিন্নতা আছে এবং হয় ত চিরকাল থাকিবে। কিন্তু জাতি হিসাবে সকলেই এক—সকলেই ভারতবাসী। বিভিন্ন সংস্কৃতির উপর খুব জোর দেওয়া হয়। কিন্তু এদেশের সংস্কৃতির সমন্বয়ও হইয়াছে, আজিও হইতেছে এবং চিরকালই হইতে থাকিবে। সংস্কৃতির কোন সাম্প্রদায়িক নাম নাই। সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিতে সমন্বয় হইতে হইতে এমন যুগ আসিবে যখন সমগ্র ভারত হইতে সংস্কৃতি-সঙ্কটের চির অবসান হইয়া যাইবে। যোগাযোগের ফলে যে সঙ্কর সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করিবে, তাহা হিন্দু সংস্কৃতি নয়, মুসলিম সংস্কৃতি নয়—তাহার সাধারণ নাম হইবে ভারতীয় সংস্কৃতি। লীগপন্থীরা বলিয়া থাকেন যে, ভারতে খৃষ্টান ইউরোপের নজীর অচল। কিন্তু আমার তাহা মনে হয় না। রাজনৈতিক আন্দোলনের দিনে তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায় ও প্রশ্রয়ে যে সব সমস্যা আজ দেখা দিয়াছে স্বাধীন ভারতে তাহা থাকিবে না। বিবাদমান সম্প্রদায় তখন এক না হইয়া থাকিতে পারিবে না। ইসলাম ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য আছে সত্য; কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এমন একটা ঐক্যবোধ রহিয়াছে—যাহা শত

বিঘ্ন-বিপত্তি সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সমাধান করিতে থাকিবে। ধর্ম্মের যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, যাহারা সাত শত বৎসর ধরিয়া এই দেশে বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে মিলন ও সহযোগিতার ভাব না জাগিয়া পারে না। এই ঐক্যবোধ ধীরে ধীরে আমাদের ধর্ম্মগত পার্থক্যকে বড় করিয়া দেখাইতে দিবে না। অনেকে মনে করেন যে, মুসলমানের ভ্রাতৃপ্রেম এত গাঢ় যে তাহা কোন ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ থাকিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানে নিকট-প্রাচ্য যেভাবে জাতীয়তার ভিত্তিতে জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাতে উক্ত প্রকার দাবী আর চলিতে পারে না। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখাইতে পারি যে, ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ জাতীয়তার অভাবেই আজ মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলি পরাধীন। বিশাল তুর্কি সাম্রাজ্য অখণ্ড অবস্থায় থাকিতে পারে নাই; জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি দেশ হইতে তুর্কি সাম্রাজ্য অনেক গুণে বড় ছিল। কিন্তু আজ কোথায় তুর্কি সাম্রাজ্য, আর কোথায় জার্ম্মাণী, ফ্রান্স ও ইতালী? কেন এমন হইল? উত্তরে বলিব—তুরস্ক সাম্রাজ্য জাতীয়তা গড়িতে পারে নাই। তুর্কি সুলতানগণ যতদিন প্রবল ছিলেন, ততদিনই তাঁহারা বিশ্ব-মুসলিম, প্যান-ইসলামিজম—এই সব অবাস্তব বিষয় লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। ইউরোপের প্রত্যেক প্রদেশ যখন জাতীয়তা ও নিয়মতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠিতেছিল, তুরস্কে তখন মধ্য যুগীয় ধর্ম্মতন্ত্র ও স্বৈরাচার অপ্রতিহত গতিতে রাজত্ব করিত। আজ ভারতীয় মুসলমানকেও তুরস্কের সেই বস্তাপচা আদর্শ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এবং অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া বর্ত্তমান তুরস্ক যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, সেই ভাবে জাতীয়তা গঠনের দিকে

মনোনিবেশ করিতে হইবে। এবং ভারতবর্ষকে অখণ্ড ভাবিয়া এই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া ও সহযোগিতা করিয়া আমাদিগকে জাতীয়তা গঠনের কাজে অগ্রসর হইতে হইবে।

এখন দেখিতে হইবে, এই জাতীয়তা গঠনের পথে কি কি বাধা আছে। ইহার মধ্যে কোন্‌গুলি প্রধান, আর কোন্‌গুলি অপ্রধান তাহাও বাছিয়া লইতে হইবে। পৃথিবীতে যাহারা বড় বড় জাতি বলিয়া আজ পরিচিত, প্রাচীনকালে তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা বলিয়া কোন জিনিষ ছিল না। প্রত্যেক রাজ্য ছিল একজন শাসকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় ইহা হস্তান্তর করা চলিত, বন্ধক দেওয়া চলিত, বিবাহে যৌতুক দেওয়া চলিত, এমন কি বিক্রয় করা চলিত। জনসাধারণ নির্ব্বিবাদে ইহা মানিয়া লইত। এইরূপ নিয়ম ছিল বলিয়া একই রাজার পক্ষে একাধিক দেশের অধিপতি হওয়া সম্ভব ছিল। জার্ম্মাণীর হ্যানোভার দেশের ক্ষুদ্র শাসকের পক্ষে ইংলণ্ডের রাজা হওয়া এই জন্য সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নীতি পরিত্যক্ত হইল। অন্য নানা উপাদান মিশ্রিত হইয়া ইউরোপের রাষ্ট্রীয় আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইল এবং জাতীয়তাকেই প্রত্যেক দেশ গ্রহণ করিল। কিন্তু এই জাতীয়তাকে চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বিভিন্ন দেশের মধ্যে নানা সমস্যা আসিয়া দেখা দিয়াছিল। জাতিত্ব সমস্যা, ভাষা সমস্যা, ধর্ম্ম সমস্যা, সংস্কৃতি সমস্যা প্রভৃতি সবই ইউরোপের জাতীয়তার আদর্শকে ব্যাহত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু জনসাধারণের ইচ্ছা ও দেশের স্বাধীনতার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ এবং এই ধরণের আরও কতকগুলি সাধারণ আদর্শ শেষ পর্য্যন্ত জাতীয়তার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাওয়া যাইবে, ব্রিটিশ অধিকারের পূর্ব্বে এখানেও রাজ্যগুলি শাসকদের কতকটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়াই বিবেচিত হইত। ভারত যদি পরাধীন না হইত, তাহা হইলে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির আদর্শ পরিত্যক্ত হইত এবং নবযুগের প্রভাবে এখানে পরিপূর্ণ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইত। কি হইতে পারিত তাহা এস্থলে আলোচনা করিয়া সময় নষ্ট করিব না। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, ভারতের জাতীয়তার আদর্শ নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না। এখানে জাতীয়তা গঠনের পক্ষে যেমন কিছু কিছু বাধা আছে, ঠিক সেইরূপ জাতীয়তা গঠনে সহায়তা করে এমন কতকগুলি শক্তিশালী উপাদানও বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা নাই তাহার অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিব না, কিন্তু যাহা আছে তাহা উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন? স্বীকার করি, সমগ্র ভারতে এক ভাষা নাই, এক ধর্ম্ম নাই, পরিপূর্ণ সাম্প্রদায়িক একতা নাই। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ, আর্থিক স্বার্থ, ভারতবর্ষের সকলের যে এক, একথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। ভারতে ভাষার বিভিন্নতা এক অদ্ভুত বস্তু, ধর্ম্মের বিভিন্নতার সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। ভাষা সমস্যা একেবারেই প্রাদেশিক ব্যাপার। বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গলা কথাই বলে, অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু-মুসলমান সেই প্রদেশ প্রচলিত ভাষাই ব্যবহার করে। সুতরাং ভাষা বিভিন্ন বলিয়া যে জাতীয়তা গড়িবে না, ইহা যুক্তি সঙ্গত কথা নহে। বহু যুগ পর্য্যন্ত সমগ্র ইংলণ্ডে একই ভাষা প্রচলিত ছিল না। এঙ্গল, ব্রিটন, নর্ম্মান এই সব জাতির ভাষা একই সঙ্গে ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে সমগ্র

ইংলণ্ড এক ভাষা গ্রহণ করিল। সর্ব্ব ভারতীয় ভাষার অভাবে ভারতের জাতীয়তার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে বিশেষ অসুবিধা হইবে না। তাছাড়া এখানে ত আর Unitary Government হইবে না। যুক্তরাষ্ট্রই হইবে ভারতের জন্য আদর্শ শাসন পদ্ধতি। এখানে প্রাদেশিক ভাষা অক্ষত অবস্থায় থাকিবে। সর্ব্ব ভারতীয় ভাষা আজ নাই সত্য, কিন্তু তাহার জন্য চেষ্টা হইতেছে, হয়ত ভবিষ্যতে ভারতেরই কোন একটা ভাষা রাষ্ট্র ভাষার মর্য্যাদা লাভ করিবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্ম্মের বিভিন্নতা জাতি গঠনের পথে কোনওরূপ বাধা সৃষ্টি করিবে না। যদিও সাম্প্রদায়িক সভা-পন্থিগণ সাধারণের ধর্ম্মানুভূতিতে আঘাত দিয়া দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিবার পথ সুগম করিয়া দিতেছেন, তথাপি আমরা দেখিতেছি, এই সাম্প্রদায়িকতা প্লাবিত যুগেও লোকে অনুভব করিতেছে যে, ধর্ম্মটা ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই ভাব যত দ্রুত অগ্রসর হইবে, তত দ্রুত জাতীয়তা গঠনের বাধাগুলি অপসারিত হইবে। সাম্প্রদায়িক নেতাদের দৃষ্টি একদিকে নিবদ্ধ, অন্যদিকে কি হইতেছে তাহা দেখিবার মত ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। কিন্তু যাঁহারা জাতীয়তা গঠনের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে সব দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। সেইরূপ অপক্ষপাত দৃষ্টি দিয়া আমরা দেখিতেছি যে, জাতি গঠনের পথে বাধা আছে, কিন্তু এমন উপাদান আছে যাহার প্রভাবে আমরা সব বাধা-বিঘ্ন পায়ে দলিয়া সমগ্র দেশকে এক জাতিতে পরিণত করিতে পারিব। ভারতে জাতি গঠনের আশা সুদূরপরাহত নহে। ধর্ম্মের বিভিন্নতার জন্য ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিতে হইবে না। ভারতের একাংশকে অপর দেশের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে না। যে ভারত আর্য্য-অনার্য্যকে এক করিয়াছে, হুণ, শক, মোগল,

পাঠানকে আপনার উদার বুকে আসন দিয়াছে, সেই ভারত হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান-পার্শিকে এক করিতে পারিবে। এক দেশ, এক জাতি, এক স্বার্থ, এক আদর্শ—এইভাবে ভারত উদ্বুদ্ধ হইবে, সংগঠিত হইবে, বিশ্বের বুকে আপনার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিবে।

ভারতে জাতীয়তা গঠনের উপাদান

ভারতে জাতীয়তা গঠনের বাধা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে দেখাইয়াছি যে, সেইসব বাধা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য নহে। সেই বাধা সত্ত্বেও যদি আমরা দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করি, তাহা হইলে সমগ্র দেশবাসীকে একই আদর্শে ও একইভাবে সংগঠিত করা অসম্ভব নহে। এইবার দেখাইতে চেষ্টা করিব, ভারতে জাতীয়তা গঠনের কোন উপাদান আছে কি না। ধর্ম্মের বিভিন্নতা যে জাতি গঠনে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না তাহা আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। সমগ্র প্রদেশবাসীকে লইয়া একটি জাতি বা নেশন গঠিত করিতে হইলে দেশবাসীর প্রত্যেকের একই Race-ভুক্ত হইবারও দরকার নাই। সকলের জন্য একই ভাষাও অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় নহে। উদাহরণ স্বরূপ সুইজারল্যাণ্ডের নজির দেওয়া যাইতে পারে। সেখানে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে, ধর্ম্মমতও সকল লোকের এক নহে, এবং একই Race হইতেও সকলে উদ্ভূত নহে। কিন্তু আজ বহু যুগ হইতে তাহারা একই "নেশনের" অন্তর্ভুক্ত হইয়া পরম স্বস্তির সহিত নিজেদের স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। একই জাতির অন্তর্গত হইয়া থাকিবার এমন একটা অনুভূতি তাহাদের মধ্যে জাগ্রত রহিয়াছে যে, শত বিভিন্নতা ও বৈষম্য সত্ত্বেও তাহারা একই হইয়া আছে। তাহাদের এই জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা নাই। মানুষ জাতীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হয় কখন? ইহার জন্য কতকগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্য

থাকা চাই। প্রথমতঃ মানব সমাজের এক অংশকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট অংশে বাস করিতে হইবে। সেখানে কতকগুলি বিষয়ে তাহাদের সকলেরই স্বার্থ এক ও অভিন্ন হওয়া চাই। এই স্বার্থ এরূপ এক ও অভিন্ন হইবে যে, জগতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সেই প্রকার স্বার্থ হইতে ইহা বিভিন্ন। এই প্রকার স্বার্থের পার্থক্য থাকার কারণ এক অঞ্চলের লোক নিজেদেরকে অপর অঞ্চলের লোক হইতে পৃথক বিবেচনা করে। পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসিগণ যখন একই শাসনাধীনে থাকিতে চাহে ও এমনভাবে স্বাধীন হইতে চাহে যেন অন্য কোন দেশের লোক তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারে এবং তাহাদের দেশ তাহাদের নিজেদের দ্বারা শাসিত হইতে পায়—তখনই তাহাদের সমষ্টিকে জাতি বা "নেশন" বলে। সুতরাং জাতীয়তার জন্য চাই একটা দেশ, এবং সমস্বার্থবোধক একটা অনুভূতি। বিভিন্ন দেশের ইতস্ততঃভাবে বিক্ষিপ্ত লোক লইয়া জাতি গঠিত হইতে পারে না। ইংলণ্ডের য়িহুদী, ফ্রান্সের য়িহুদী, জার্ম্মাণীর য়িহুদী একত্র মিলিত হইয়া জাতি গঠন করিতে পারে না। সেইরূপ ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য, মিসর প্রভৃতি দেশের মুসলমান লইয়া জাতি গঠিত হইতে পারে না। প্রত্যেক স্বতন্ত্র দেশের য়িহুদী বা মুসলমানকে এক একটা নির্দ্দিষ্ট দেশের অপরাপর অধিবাসীদের সহিত মিলিত হইয়া জাতি গঠন করিতে হইবে; অথবা তথায় যদি অন্য কোন জাতি থাকে, তবে তাহার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিয়া যাইতে হইবে। এই দেশ পরাধীন হইলে সকলের সহিত মিলিত হইয়া স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং স্বাধীন হইলেও সকলের সমবেত চেষ্টায় দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। পরাধীন

দেশ যখন স্বাধীন হইতে চায়, তখন সাধারণ রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বার্থই দেশের বিবদমান লোকগুলিকে একত্র করিতে পারে। এই আদর্শের প্রভাবে তাহারা তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্যগুলি বিস্মৃত হইয়া যায়। বৃহত্তর আদর্শ ও স্বার্থের অনুরোধে দেশের লোকের মধ্যে এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে সকলের একই বিপদ, একই অভাব, একই অসুবিধা, সেখানে তাহারা অধিক দিন পৃথক হইয়া থাকিতে পারে না। ধর্ম্মের পার্থক্যটা তখন আর বড় হইয়া দেখা দেয় না। তাহাদের পূর্ব্ব ইতিহাসের গৌরবের কাহিনী, অপমানের ব্যথাময় স্মৃতি, তাহাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথাকে আরও পরিষ্কারভাবে ফুটাইয়া তুলে এবং এই সব কথা স্মরণ করিয়া তাহারা নিজেদেরকে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ভাবিতে শিখে। সে দেশে এইভাবে জাতীয়তা গড়িয়া উঠে। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিলে মনে হইবে যে, এখানে জাতীয়তা গঠনের সহায়ক এইসব উপাদান বিদ্যমান আছে। আমাদের সকলের রাজনৈতিক স্বার্থ এক, আর্থিক স্বার্থও এক। আমরা সকলেই স্বাধীন হইতে চাই। অপরে আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করুক ইহা আমরা কেহ চাহি না। ভারতবাসীরাই ভারতবর্ষ শাসন করিবে, ইহাই সকলের দাবী। ভারতের বাহিরের লোকের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থ বিভিন্ন —এ বোধ আমাদের সকলেরই হইয়াছে। আমাদের ব্যথা-বেদনার কাহিনী সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করে। নবাব সিরাজদ্দৌল্লা ও মির কাসিমের পরাজয়ে ব্যথিত হয় না এমন হিন্দু-মুসলমান ভারতে একজনও নাই। মোগল ও পাঠান আমলের অত্যাচারের কথায় লোকে যেমন শিহরিয়া উঠে, সে যুগের সুখ-

সুবিধার প্রতিও তেমনি আমরা আকৃষ্ট হইয়া থাকি। বর্ত্তমানের দুঃখ-কষ্ট, অভাব ও অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তার যুগ হইতে সেই সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও দুর্য্যোগপূর্ণ দিনের প্রতিই আমাদের টানটা যেন একটু বেশী হইয়া পড়ে। মনে হয় নির্ব্বীর্য্য হইয়া এরূপ নিরাপদ অবস্থা অপেক্ষা সে যুগের সেই উপদ্রবপূর্ণ দিনই যেন শতগুণে ভাল ছিল। এই যে অনুভূতি, এই যে সমস্বার্থবোধক মনের ভাব—ইহা এদেশে জাতীয়তা গঠনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পরাধীন না হইলে এতদিন আমরা একটা বিরাট জাতিতে পরিণত হইতে পারিতাম। জাতীয়তা গঠনের পথে পরাধীনতাই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ প্রতিবন্ধক। ইহা অপসারিত হইলে আমরা অনায়াসে এক জাতিতে পরিণত হইতে পারিব।

মিষ্টার জিন্না, ডাক্তার লতিফ প্রমুখ লীগপন্থী নেতাগণ স্বীকার করিতে চাহেন না যে, ভারতে জাতীয়তা গঠনের কোন উপাদান থাকিতে পারে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতে সে উপাদান আছে। স্বাধীনতার প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ যতই বাড়িতে থাকিবে, ততই আমাদের জাতীয়তার বন্ধন দৃঢ় হইবে। এই স্বাধীনতার আদর্শকে সামনে রাখিয়া ইংলণ্ড এক হইয়াছে, আমেরিকা এক হইয়াছে, বেলজিয়াম এক হইয়াছে এবং আমরাও অচিরে এক হইব। স্বাধীনতার প্রেরণার ফলে আমরা এমন এক শক্তির অধিকারী হইব যাহার কারণে আমরা আমাদের সমাজ জীবনের অসামঞ্জস্য ও বৈষম্যকে বিসর্জ্জন দিতে পারিব; ইহাই আমাদের মনে সর্ব্বজনীন নৈতিক চরিত্র সৃষ্টি করিতে সহায়তা করিবে। ভারতের স্বাধীনতা ও স্বাজাতিকতা এক সঙ্গে জড়িত। একটাকে বাদ দিয়া আর একটা হইতে

পারে না। স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহকে ডাঃ লতিফ ঘৃণা ভাবোদ্দীপক আদর্শ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু স্বদেশ-প্রেম আর বিজাতি বিদ্বেষ এক কথা নয়। আমাদের স্বদেশ-প্রেম ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ জানাইবার কৌশল নয়, ইহা স্বাধীনতা লাভের জন্য ঐশ্বরিক অনুভূতি। ইহাকে যদি Hymn of hate বলিতে চান, বলুন; কিন্তু তাই বলিয়া দেশের কেহই স্বাধীনতা ও স্বাদেশিকতার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না। আমরা যখন বলি এদেশের সকলের আর্থিক স্বার্থ এক, তখন লতিফ সাহেব উহাকে মার্কস-গন্ধী আদর্শ বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। কিন্তু একথা আমরা জোর করিয়া বলিব, যে দেশের লোক দুইবেলা পেট পুরিয়া খাইতে পারে না, তাহাদের নিকট ক্ষুধা-নীতিই একমাত্র ধর্ম্ম। পেটে ক্ষুধা রাখিয়া মুসলিম 'কালচার' লইয়া কাহারও কোনও উপকার হইবে না। দরিদ্র ও অনশন পীড়িত মুসলমানের নিকট মুসলমান কালচারের যতই বড়াই করুন না কেন, মার্কসের ক্ষুধা-নীতি তাহাদের প্রকৃত চৈতন্য সম্পাদন করিবে। আর এই ক্ষুধা-নীতি দেশের হিন্দু-মুসলমানকে একই ক্ষেত্রে মিলিত করিবে। মানুষের ধর্ম্মান্ধতা দূর করিবার, বস্তুতঃ এক জাতি গঠনের কর্ম্মতালিকায় ক্ষুধা-নীতি প্রধান উপায়। ইসলাম বিপন্নের ধুয়া তুলিয়া লীগপন্থিগণ সাধারণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহারা শীঘ্রই বুঝিবে, কোন দিনই ইসলাম বিপন্ন হয় নাই, বরং বিপন্ন হইয়াছিল তথাকথিত নেতাদের স্বার্থ। ক্ষুধা-নীতিকে চাপা দিয়া জিন্নাপন্থীরা ধর্ম্মের নামে যে আন্দোলন চালাইতেছেন তাহার পরিণাম, না ইসলামের পক্ষে, না তাঁহাদের পক্ষে, কাহারও পক্ষে ভাল হইবে না। কারণ জনসাধারণ যদি একবা

বুঝে যে, সংস্কৃতির নামে তাহাদের ক্ষুধাকে দাবাইবার চেষ্টা হইতেছে, তখন তাহারা সে সংস্কৃতির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবে। তখন দেশে রাশিয়ার অবস্থারই পুনরাভিনয় হইবে। বস্তুতঃ দেশের দারিদ্র্য যেখানে সব চেয়ে বড় সমস্যা, সেখানে সংস্কৃতির মিথ্যা দোহাই দেওয়া শুধু ভুল নয়, আত্মঘাতী কাজ। অনাগত ভারতে কোন প্রকার সংস্কৃতি অব্যাহত থাকিবে তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না; কিন্তু সংস্কৃতি যাহাই হউক না কেন, জনসাধারণের ক্ষুধার চিরনিবৃত্তি হইবেই। উদর যাহাদের ভর্ত্তি থাকিবে, তাহারা নিজেদের সংস্কৃতি ও ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারিবে। তাহার জন্য জিন্না সাহেব অথবা লতিফ সাহেবের আশ্রয়প্রার্থী হইতে হইবে না।

জিন্নাপন্থীরা কংগ্রেসের আদর্শ বর্ণনা করিবার সময় উহাকে এরূপভাবে বিকৃত করিয়া দেখান যে, অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ লোক তাহার দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। কংগ্রেস আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া যে সংগ্রাম করিতেছে, তাহা হিন্দুরাজ স্থাপনের জন্য নহে, তাহা দেশেরই সাধারণ কল্যাণের জন্যই। কংগ্রেসের আইন অমান্য নীতি ও অসহযোগ নীতি অনেকে পছন্দ না করিতে পারেন। কিন্তু কংগ্রেসের জাতীয়তার আদর্শ সর্ব্বদোষমুক্ত। একদিকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা—অপর দিকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা—এই দুই শক্তিকে দাবাইয়া কংগ্রেস জাতীয়তার যে আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছে তাহা অপেক্ষা সুন্দরতর আদর্শ ভারতে অদ্যাপি কেহ দিতে পারে নাই। জিন্না সাহেব যে Militant Hinduism-এর ভয়ে এত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা দমন করিবার মত শক্তি একমাত্র কংগ্রেসরই আছে। জাতীয় জীবনে ধর্ম্ম, ব্যক্তিগত আইন ও সংস্কৃতির যে কোনই মূল্য নাই তাহা নহে, কিন্তু এসব

নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার। এগুলি লইয়া হৈ চৈ করিবার কোন আবশ্যক নাই। আইন সভায় হিন্দুদের সাহায্যে যাঁহারা মুসলিম বিবাহ আইন পরিবর্ত্তন করিতে সাহস পান, তাঁহাদের মুখে ইসলামিক ব্যক্তিগত আইনের পূর্ণতার দাবী শোভা পায় না। বর্ত্তমানে মুসলমানের ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্ত্তনের দরকার হইয়াছে। কারণ যুগোপযোগী আদর্শ ও প্রয়োজন তাহার পশ্চাতে নাই। বৃহত্তর আদর্শের জন্য, দেশের সকল সম্প্রদায়ের জন্য একই আইন হওয়া অন্যায় ত নহেই, বরং তাহাই বাঞ্ছনীয়। যখন শারদা আইন, মোস্লেম বিবাহ আইন, ওয়াকফ্ আইন প্রভৃতি সময়ের দাবী অনুসারেই সংশোধিত হইয়াছে, তখন অন্যান্য আইনের কেন পরিবর্ত্তন হইবে না, তাহা আমরা বুঝি না।

ডাক্তার লতিফ সাহেব একস্থানে বলিয়াছেন, "ব্যক্তিগত আইন ও সংস্কৃতি লইয়া মুসলমানের জীবনের কারবার।" কিন্তু ইহা মোটেই ঠিক নহে। তাহাই যদি হইবে, তবে তুরস্ক ব্যক্তিগত আইন পরিবর্ত্তন করিয়া অনৈস্লামিক দেশের আইন স্বদেশে প্রবর্ত্তন করিত না। সব দেশেই ব্যক্তিগত আইন নানাভাবেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আর ভারতেও জাতীয়তার আদর্শ প্রসারের সহিত উহা পরিবর্ত্তিত হইবে। কালে সমগ্র ভারতবাসীর জন্য একই ব্যক্তিগত আইন প্রস্তুত হইবে। ইহাতে ইসলাম বা হিন্দুধর্ম্ম বিপন্ন হইবে না। মুসলমানের শিক্ষা, আর্থিক সমস্যা—কোন কিছুই অপর হইতে পৃথক নহে। সুতরাং মুসলমানের শিক্ষার ভার হিন্দুর হাতে এবং হিন্দুর শিক্ষার ভার মুসলমানের হাতে থাকিলে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। ধর্ম্ম ও রাজনীতিকে একই সূত্রে গাঁথিবার দিন গত হইয়াছে।

ইহাতে ধর্ম্মের চাপে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের চাপে ধর্ম্ম দুই-ই ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই দুইটাকে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। লতিফ সাহেব বলিতেছেন: "যদি জীবনের সকল ব্যাপারে শরীয়ৎ স্বীকৃত হয়, তবে রাষ্ট্রের সকল বিভাগে ইসলামের সংরক্ষণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন। যদি আইন, শিক্ষা সব কিছুই ইহার অধীনে চলিয়া যায়, তবে দেশের একজাতীয়তা গঠনের জন্য রাষ্ট্রের আর কি থাকে?" এই যুক্তি বালকোচিত। বৃটিশ সরকার যদি প্রতিদ্বন্দ্বী শাসন ব্যবস্থার বিধান না করিয়া ইসলামকে রক্ষা করিতে পারেন, তবে স্বাধীন ভারতে ভারতবাসীও তাহা পারিবে। তারপর আইন ও শিক্ষার জন্য মুসলমানের স্বতন্ত্র ব্যবস্থার দরকার নাই। কয়েকটি মক্তব্ মাদ্রাসা ব্যতীত ভারতে কোথাও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না। সকলের জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে, মুসলমানের জন্যও তাহাই চলিবে। তবে টোল ও পাঠশালার মত মক্তব ও মাদ্রাসা ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় চলিতে থাকিবে, তাহাতে কেহই বাধা দিবে না। ভারতে জাতীয়তা গঠনের বিরুদ্ধে ডাঃ লতিফ সাহেব যে অবান্তর যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন আমি তাহা খণ্ডন করিবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে লীগপন্থীগণের চৈতন্যোদয় হইবে কি না বলিতে পারি না। আমার বিশ্বাস ভারতকে যে ভালবাসে, সে কখনও ডাঃ লতিফের আদর্শ দ্বারা বিভ্রান্ত হইবে না। ভারতে জাতীয়তা গঠনের বহু উপাদান রহিয়াছে। যদি আমরা স্বাধীনতার আদর্শকে সামনে রাখিয়া অগ্রসর হই, তবে নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্যগুলি আপনা হইতে চলিয়া যাইবে। এবং স্বাধীনতার মাদকতায় আমরা একজাতিতে পরিণত

হইতে পারিব। আমাদের পথের কাঁটা দূর হইয়া যাইবে, সকলকে আপনার করিয়া লইবার শক্তি জাগ্রত হইবে। সেই শক্তির প্রভাবে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, সবই এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে।

ভারতীয় মুসলমানগণ কোন জাতি?

ভারতীয় মুসলমানগণ কোন্ জাতির অন্তর্গত? ভারতের বাহিরে তাহারা যে দেশেই গমন করুক না কেন, সেইখানেই তাহারা হিন্দী (Indian) বা ভারতীয় বলিয়া পরিচিত। চীন, জাপান, আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে কেহই তাহাকে ভারতবাসী ব্যতীত অন্য কোন নামে অভিহিত করিবে না। এমন কি আরব, মিসর, পারস্য প্রভৃতি মুসলিম প্রধান দেশও সে হিন্দী নামে কথিত হইয়া থাকে। অথচ ভারতীয় মুসলমানগণ স্বদেশে নিজেদিগকে ভারতীয়, হিন্দী অথবা ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত হইতে এত কুণ্ঠিত কেন? ভারতীয় হওয়াটা কি এতই লজ্জাজনক ব্যাপার যে তজ্জন্য নিজেদের প্রকৃত পরিচয় গোপন করিতে হইবে? ভারতের অধিবাসীর ধর্ম্ম যাহাই হউক না কেন, সে ভারতবাসী ভিন্ন আর কিছুই নহে। জাতি ও ধর্ম্ম এই দুইটি শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া যাঁহারা ভ্রম করিয়া থাকেন এবং সেই ভুলের উপর দাঁড়াইয়া সমস্ত ব্যাপারটিকে ঘোরাল করিয়া তুলেন, তাঁহাদের আদর্শকে কি শাশ্বত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? ভারতীয় হিন্দুগণ, খৃষ্টানগণ, শিখগণ, পার্শিগণ অথবা বৌদ্ধগণ যে জাতির অন্তর্গত, মুসলমানগণও সেই জাতির অন্তর্গত। ধর্ম্মে ইহারা পৃথক হইলেও জাতিত্বের দিক হইতে ইহারা সকলেই একই সমাজের ও একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। ধরুন, ইসলাম প্রচারকগণের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে কয়েক লক্ষ হিন্দু স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। তাই বলিয়া

কি জাতিত্বের দিক হইতেও তাহারা পৃথক হইয়া গেল ? অথবা বহু মুসলমান আর্য্য সমাজীদের প্রভাবের ফলে শুদ্ধি দ্বারা হিন্দু হইয়া গেল, তাই বলিয়া কি তাহাদের জাতিত্ব বদলাইয়া গেল ? ভারতে হিন্দু বলিয়া কোন জাতি নাই, মুসলমান বলিয়া কোন জাতি নাই। এই সব নামে ধর্ম্ম আছে। কিন্তু জাতিত্বের দিক হইতে সকলেই এক—একই অধিকারে অধিকারী ও একই পথের পথিক। অথচ এই সরল সত্যকে আজ লীগ-নেতারা অস্বীকার করিতে চাহিতেছেন। কারণ, জাতি বলিতে তাঁহারা ধর্ম্মকেই বুঝেন। কিন্তু জাতি আর ধর্ম্ম এক বস্তু নহে। আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য মানুষ একটা ধর্ম্মমত গ্রহণ করে। প্রত্যেক স্বাধীন দেশে স্বাধীন চিন্তার অধিকার থাকে। সেই জন্য যাহার যখন ইচ্ছা ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিতে পারে, অথবা ধর্ম্মকে একেবারেই বাদ দিতে পারে, এমন কি ভগবানকেও অস্বীকার করিতে পারে। জাতিত্ব ইহা নহে। একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আর্থিক ও রাজনৈতিক আদর্শে সমস্বার্থবিশিষ্ট যে সব লোক বাস করে, ধর্ম্ম তাহাদের যাহাই হউক না কেন, তাহাদেরই সমষ্টিকে জাতি বলে। একই দেশে ভাষার পার্থক্য থাকিতে পারে, সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য থাকিতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শ যদি অভিন্ন হয়, তবে তাহাদের সমষ্টিই জাতি বলিয়া পরিচিত। জগতের সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। ভারতে কেন ইহার ব্যতিক্রম হইবে ? লীগ পন্থীরা তাঁহাদের যুক্তির সমর্থনে পোল্যাণ্ড ও চেকশ্লোভাকিয়ার উদাহরণ উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই দুইটি দেশে ধর্ম্ম ও ভাষার পার্থক্য থাকার কারণে প্রকৃত জাতীয়তা গঠিত হইতে পারে নাই। কিন্তু এই দুইটি

প্রদেশের উদাহরণ এখানে খাটে না। কারণ এই দুইটি রাষ্ট্র একেবারেই কৃত্রিম রাষ্ট্র। আপনার স্বাভাবিক গতিতে কার্য্যকারণের সংযোগে ইহাদের উৎপত্তি হয় নাই। গত মহাযুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তিপুঞ্জ নিজেদের মতলব, হাসিল করিবার জন্য একেবারেই কৃত্রিম উপায়ে এই দুইটি রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিলেন। তাই এখানে প্রকৃত জাতীয়তা গঠিত হইতে পারে নাই। কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পোল্যাণ্ডে প্রকৃত জাতীয়তা ছিল। ভারতবর্ষ কৃত্রিমভাবে গঠিত দেশ নয়। স্বয়ং প্রকৃতিদেবী ইহার সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। এই সীমার মধ্যে যাহারা বাস করে, তাহারা স্বাভাবিক গতিতে বিকশিত হইয়াছে এবং অপরের বিনা হস্তক্ষেপে তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা গঠিত হইয়াছে। প্রকৃতিদত্ত ও অনায়াসলব্ধ এই যে জাতীয়তা, তাহা কেন আমরা কতকগুলি ভুঁইফোড় নেতার খেয়াল মিটাইতে গিয়া অস্বীকার করিয়া বসিব? ভারতের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য ও অনৈক্য অপেক্ষা সমতা ও একতাই যে অধিক পরিমাণে আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে একটুও কষ্ট পাইতে হইবে না। ভারতে আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতে আগত মুসলমানের বংশধর আছে সত্য, কিন্তু হিন্দু ও আদিম অধিবাসীদের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এমন মুসলমানের সংখ্যাও কম নহে। এমন কি অর্দ্ধেকেরও অধিক মুসলমান এই শ্রেণী হইতে আসিয়াছে। যদি এই শ্রেণীর মুসলমান লইয়া এক জাতি হইতে পারে, তবে অ-মুসলমানকে লইয়া সেই জাতিত্বের চক্রটাকে আরও একটু বাড়াইয়া লইলে কি এমন ক্ষতি হইতে পারে? বহু মুসলমান যে মূলতঃ হিন্দু রক্ত হইতে উদ্ভূত, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

তারপর ভাষার কথা। ভারতবর্ষে ধর্ম্মের ভিত্তিতে কোন ভাষা প্রচলিত নয়। এদেশের ভাষা প্রাদেশিক ভিত্তিতে প্রচলিত আছে। যে প্রদেশের যে ভাষা, সেই প্রদেশের হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সেই ভাষা ব্যবহার করে। বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত, এ ভাষা হিন্দু মুসলমান সমভাবেই ব্যবহার করে। হিন্দী ভাষা, উর্দ্দু ভাষা, গুজরাটী ভাষা, তামিল, তেলেগু ভাষাও হিন্দু মুসলমান সমভাবেই ব্যবহার করে। সুতরাং ভাষার ভিত্তিতে লোক-দিগকে বিভাগ করিলে হিন্দু মুসলমান এইভাবে বিভক্ত হইবে না। প্রত্যেক বিভাগেই হিন্দুও থাকিবে, মুসলমানও থাকিবে। সেদিক দিয়া হিন্দু-মুসলমানকে স্বতন্ত্র পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। বাঙ্গলা ভাষায় মুসলমানের দান আছে, হিন্দুরও দান আছে। হিন্দী, উর্দ্দু, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় হিন্দু মুসলমান উভয়েই সাহিত্য চর্চ্চা করেন এবং ঐসব ভাষাকে নিজেদের মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। উর্দ্দুভাষী হিন্দুগণ উর্দ্দু অক্ষরই ব্যবহার করেন এবং হিন্দীভাষী মুসলমানগণ হিন্দী অক্ষরই ব্যবহার করেন। বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুরা বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করেন। এই ভাষার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাহারা মিলিয়া যদি একজাতি হইতে পারে, তবে তাহাদের এই জাতিত্বের পর্য্যায়ে মুসলমানগণ কেন পড়িবে না? একথা সত্য যে, ধর্ম্মের পার্থক্যের কারণে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে, শাস্ত্রীয় আচার পদ্ধতি লইয়া অনেক পার্থক্য আছে। কিন্তু ধর্ম্মীয় আচার বাদ দিলে সামাজিক বিষয়ে এবং এদেশের অধিবাসী হিসাবে তাহাদের আচার ব্যবহারে অদ্ভুত সামঞ্জস্য ও ঐক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন কি চেহারার মধ্যেও সাদৃশ্য দেখা যায়। চোগা চাপকান পরিধান করিলে হিন্দুকে

মুসলমানের মতই দেখায় এবং ধুতি চাদর পরিলে মুসলমানকেও হিন্দুর মত দেখায়। কোনরূপ পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। ইহা যদি এক জাতীয়তার নিদর্শন না হয়, তাহা হইলে বিশ্বের কোথায়ও জাতীয়তা পরিলক্ষিত হইবে না। সেই মুসলিম যুগ হইতে একদিকে সুফি মতবাদ, অন্য দিকে বৈষ্ণব মতবাদ পাশপাশি প্রচারিত হইয়া এদেশের লোকের ধর্ম্মের গোঁড়ামি অনেকটা হ্রাস করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রচারের ফলে লোকের মধ্যে এমন একটা এক-জাতীয়তার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, আজিও আমরা তাহার প্রভাব পরিহার করিতে পারি নাই। জাতীয়তার ভিত্তিতে আমাদের হিন্দু মুসলমানের স্বাধীনতার পথে জয়যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। আজ মুসলিম লীগের একটা কাগজের প্রস্তাবে কেন আমরা সেই আদর্শ বিসর্জ্জন দিতে যাইব ?

ভাষা ও ধর্ম্মের পার্থক্য যে জাতীয়তা গঠনের পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না, বরং এই প্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও পরিপূর্ণ ও অবিমিশ্র জাতীয়তা গঠিত হইতে পারে, তাহার ভুরি ভুরি উদাহরণ ইউরোপ ও আমেরিকার স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে পরিদৃষ্ট হইবে। পৃথিবীতে খুব কম দেশই আছে যেখানে মাত্র একটি ভাষা ও একটি ধর্ম্ম প্রচলিত। খোদ ইংলণ্ডে খৃষ্টান ধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা ত আছেই, তা ছাড়া মুসলমান, ইহুদী, নিরীশ্বরবাদী প্রভৃতি সম্প্রদায় আছে। সেখানে বিভিন্ন প্রদেশে কিছু কিছু ভাষার পার্থক্য আছে। সুইজারল্যাণ্ডে কয়েকটি ধর্ম্ম ও ভাষা প্রচলিত আছে। অথচ এই সব দেশে জাতীয়তা গঠন সম্ভব হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ এই শিক্ষাই প্রদান করে যে, ভাষা ও ধর্ম্মের পার্থক্য সত্ত্বেও জাতীয়তা গঠন

হইতে পারে। এখানেও বিশ্বপ্রচলিত কয়েকটী ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। তাছাড়া প্রাচীন আদিবাসী ত আছেই। আমেরিকায় প্রায় ষাটটি ভাষার প্রচলন। সভাপতি নির্ব্বাচনের সময় যে সব প্রচারকার্য্য হয়, তাহা ষাটটি ভাষাতেই করিতে হয়। প্রার্থিগণ বিভিন্ন সভায় বিভিন্ন ভাষাভাষীর বক্তা নিযুক্ত করিয়া নিজ নিজ দাবী সমর্থন করিবার জন্য বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করেন। অথচ আমেরিকা একটি শক্তিশালী জাতি। সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্ত আরও চমকপ্রদ। এখানে প্রায় একশত ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে এবং দুইশত ভাষা ব্যবহৃত হয়। পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি—এই সব বিষয়েও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু অর্থনৈতিক ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া এই প্রকাণ্ড দেশটির বিভিন্ন সম্প্রদায় এক হইতে পারিয়াছে। ভারতে কেন এই নিয়মের ব্যক্তিক্রম হইবে ? অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ ভারতে জাতীয়তা গঠনের বিশেষ সহায়ক। আর এই কারণ দুইটিই আমাদের পরস্পরের পার্থক্য ও অনৈক্যের ব্যবধানকে হ্রাস করিয়া দিয়াছে। তাই আজ আমরা বুক ফুলাইয়া বলিতে পারি যে, আমরা অখণ্ড জাতি।

দেশের প্রত্যেক অধিবাসীর একটি নাগরিক অধিকার আছে। আন্তর্জাতিক আইন ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এক দেশের সহিত অন্য দেশের সদ্ভাব ও সৌহৃদ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে এই নাগরিক অধিকার বিশেষ কল্যাণকর হয়। ভারতের অধিবাসিগণ অন্যান্য দেশের জাতিদের নিকট বর্ণ, ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতীয় বলিয়া অভিহিত। যে সব দেশে ভারতীয়গণকে

নাগরিক অধিকার দেওয়া হয় না, সেখানে ভারতীয় মুসলমানগণও তাহা পায় না। অথচ সেই সব দেশে তুরস্ক, মিসর, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মুসলমানগণ পরিপূর্ণ নাগরিক অধিকার পায়। আবার হয় ত কোথাও ভারতীয় জাতি কিছু বেশী সুবিধা পায়; সেই সুবিধা অন্যান্য দেশের মুসলমানগণ পায় না। ভারতীয় জাতির বাহিরে থাকিয়া ভারতীয় মুসলমানগণ সেই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে। আন্তর্জাতিক আইন ধর্ম্মের ভিত্তিকে জাতীয়তার মানদণ্ড বলিয়া স্বীকার করে না। এই আইনের চক্ষে রাষ্ট্র ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ। রাষ্ট্রকে ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ না করিলে কার্য্যক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা হয়। প্রথমতঃ এক দেশের সহিত অন্য দেশের ভাবের আদান প্রদান হয় না। ধর্ম্মীয় রাষ্ট্র সঙ্কীর্ণ হইতে বাধ্য। সেখানে মানুষের স্বাধীন চিন্তার স্ফূরণ হয় না। অন্ধতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কার আসিয়া সমস্ত উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হয় না। পূর্ব্বে অনেক রাষ্ট্র ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্রম-পরিবর্ত্তনের ফলে রাষ্ট্র হইতে ধর্ম্ম পৃথক হইয়া গিয়াছে। আজ যদি আবার সেই প্রাচীন যুগে ফিরিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে কোন দেশেরই উন্নতি হইবে না। মধ্যযুগীয় অন্ধতা আসিয়া কয়েক শতাব্দীর সাধনা ও শিক্ষাকে পণ্ড করিয়া দিবে। এই সব কথা ভারতীয় মুসলমানকে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি। ভারতের বুকে একটা জাতীয় আবাসভূমি লইয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিবার স্বপ্ন পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় জাতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিয়া যাইতে হইবে। আমরা—এদেশীয় মুসলমান—স্বতন্ত্র জাতি নহি। আমরা ভারতবাসী। আমরা ভারতের একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ।

স্বতন্ত্র জাতিত্বের দাবী করিয়া ভারতীয় নাগরিক অধিকার হইতে কেন নিজদিগকে বঞ্চিত করিতে যাইব ? ইহা অপেক্ষা আত্মহত্যাকর কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না।

পাকিস্থান কে চায় ?

লীগ দলপতি মিষ্টার জিন্না মনে করেন, ভারতের মধ্যে তিনিই একমাত্র বুদ্ধিমান ব্যক্তি,—যিনি দেশের সকল প্রকার জটিল কুটিল ও দুঃসাধ্য সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথই একমাত্র পথ, অনুসৃত আদর্শই একমাত্র আদর্শ যাহা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে পারে। তিনি ব্যতীত আর যে সব নেতা বা গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন, হয় তাঁহারা অন্ধ, নয় ত তাঁহারা "ব্রেনলেস" বা মস্তিষ্কশূন্য। অন্য নেতারা যে সব পথ বাতলাইয়া থাকেন, তাহা কুপথ ও ভ্রান্ত পথ। অতএব আইস, দেশবাসী! আমার নিকট আদর্শ গ্রহণ কর, পথের নির্দ্দেশ লইয়া যাও, আমিই তোমাদের সিদ্ধির স্বর্ণঘাটে লইয়া যাইব। গান্ধী? তাঁহার ত কোনরূপ বাস্তব জ্ঞান নাই, তিনি মরীচিকার পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ান। হিন্দু মহাসভা? সেটা আবার কিছু করিতে পারে নাকি? সে ত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। এই হিন্দু মহাসভাইত যত গণ্ডগোল বাধাইতেছে। মডারেট দল? এরা ত একেবারেই "ব্রেনলেস।" এদের না আছে সঠিক কোন আদর্শ, না আছে কোন প্রভাব। অতএব দেশে যদি কোন লোক থাকে, তবে সে লোক হইতেছেন—কাএদে-আজম মিষ্টার জিন্না। আর যদি বাস্তব পথ কিছু থাকিতে পারে, তবে তাহাও সেই মিঃ জিন্নার প্রদর্শিত পথ। কিন্তু দেশের লোক এমনি বোকা, এমনি বাস্তব জ্ঞানশূন্য যে, তাহারা এমন একজন 'ব্রেনপূর্ণ' মহাজনকে উপেক্ষা করিতেছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্ববিপদমুক্ত পথ গ্রহণ

করিতে সম্মত হইতেছে না। দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলে ? কিন্তু তাঁহার সেই বহুবিঘোষিত পথটা কি ? সেটা আর কিছুই নহে, সেটা হইতেছে— পাকিস্থান! ভারতবর্ষকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ করিয়া লও, দেখিবে সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। সংগ্রাম করিবার দরকার হইবে না, জেলে যাইবার সুযোগ হইবে না, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে না। এক পাকিস্থানই তোমার অর্দ্ধ শতাব্দীর সাধনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া দিবে। ইহাকেই বলে "ব্রেন", ইহাই হইল বাস্তব রাজনীতি ও তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি ! হায় মিষ্টার জিন্না ! তোমার এ বাস্তব রাজনীতি ও কুশাগ্রবুদ্ধি এতদিন কোথায় ছিল ? এই দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দী দেশের লোক স্বাধীনতার জন্য কত কষ্ট, কত লাঞ্ছনাই না সহ্য করিয়াছে। পূর্ব্বে এই পথের সন্ধান পাইলে দেশের ভাগ্যে এই সব দুর্ভোগ আর হইত না !

কিন্তু সমস্যা এই যে, দেশের লোক কেন পাকিস্থানের কথা বুঝিতেছে না ? কেন তাহারা এত বোকামীর পরিচয় দিতেছে ? জিন্না সাহেবের এই অযাচিত দান কেন তাহারা অকাতরে গ্রহণ করিতেছে না ? একজন দুইজন লোক নয়। মিঃ জিন্নার দলের মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোক ব্যতীত দেশের সমস্ত লোক, প্রতিনিধি স্থানীয় সমস্ত প্রতিষ্ঠান, নেতৃ স্থানীয় সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি, কেহই পাকিস্থানের তাৎপর্য্য কেন বুঝিতেছে না ? এতগুলি লোক ও এতগুলি প্রতিষ্ঠান "ব্রেনলেস", না একটিমাত্র ব্যক্তি ও তাঁহার করতলগত একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান 'ব্রেনলেস' ? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে ? অ-মুসলমানদিগকে ও তাহাদের প্রতিষ্ঠানদিগকে না হয় বাদ দিলাম। খোদ জিন্না সাহেব যে সম্প্রদায়ের লোক, সেই মুসলমান সম্প্রদায়েরই কয়জন

লোক পাকিস্থান পরিকল্পনার সমর্থন করিতেছে ? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লক্ষাধিক মুসলমান আজাদ-মুসলিম কনফারেন্সে তারস্বরে ঘোষণা করিল, তাহারা পাকিস্থান চায় না। সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান পাকিস্থানের দাবীকে সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছে। মোমিন ও শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান, যাহাদের সংখ্যা কয়েক কোটি, তাহারা দৃঢ়ভাবে পাকিস্থানের প্রতিবাদ করিয়াছে। বাঙ্গালার কৃষক প্রজার দল ত বহু পূর্ব্বেই পাকিস্থানকে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। 'জমিয়তে ওলামা' সনাতন ইসলামের দোহাই দিয়া পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়া ফেলিয়াছে। এই সব প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিলে মিঃ জিন্নার সপক্ষে কয়জন লোক থাকিতেছে ? মিঃ জিন্নার দলই ত মাইনরিটি হইয়া যাইতেছে। আবার জিন্না সাহেবের দলেরও সবাই পাকিস্থান সমর্থন করেন না। স্যার সেকেন্দার হায়াত একজন ঝুনো লীগওয়ালা। তিনি লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বিশিষ্ট সদস্য। তিনি প্রকাশ্য সভায় পাকিস্থানের নিন্দা করিয়াছেন। পাঞ্জাবের তিনি একছত্র নেতা, সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, পাঞ্জাবের বহু মুসলমান পাকিস্থানের বিরোধী। বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মৌঃ ফজলুল হক সাহেব এখনও পাকিস্থানের অর্থ সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। অন্যান্য লীগ নেতারা এবিষয়ে একদম চুপ। তাঁহারা যে মনে মনে ইহা সমর্থন করেন না, তাহা তাঁহাদের আচরণ হইতেই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র মুসলমানের মধ্যে মাত্র অতি সামান্যসংখ্যক লোক পাকিস্থান সমর্থন করে। ইহাদের মধ্যেও আবার এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা জিন্না সাহেবের মানরক্ষা করিবার জন্য পাকিস্থানের সপক্ষে

কেবল হাত তুলেন মাত্র। কিন্তু মনে মনে ইহাকে মোটেই সমর্থন করেন না। ১৯৪১ সনের লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে মাত্র পাঁচ হাজার প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ছিলেন মাদ্রাজের। সমগ্র ভারতের বড় বড় গণ্যমান্য লীগ নেতাগণ কেহই তথাকার অধিবেশনে যোগদান করেন নাই। ইহার একমাত্র কারণ, তাঁহারা জিন্না সাহেবের বাড়াবাড়ি আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না। প্রকাশ্য প্রতিবাদ না করিয়া তাঁহারা অনুপস্থিত থাকিয়াই পাকিস্থানের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন। পাকিস্থান সম্বন্ধে যদি মুসলমান-সমাজের এই প্রকার আচরণ হয়, যদি সমাজের অধিকাংশ লোক পাকিস্থান সমর্থন না করে, তবে কাহাকে লইয়া তিনি পাকিস্থান করিবেন? কোন বালুচরের উপর তিনি পাকিস্থানকে দাঁড় করাইবেন? যাঁহাদেরকে লইয়া এত মায়াকান্না, তাহারাই ত তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিতেছে, তবে কোন সাহসে তিনি নিজের ব্যক্তিগত খামখেয়ালকে গোটা মুসলমান সমাজের মত বলিয়া চালাইতে চাহিতেছেন? মানুষের অহমিকতা ও আত্মম্ভরিতার একটা সীমা আছে, কিন্তু জিন্না সাহেব দেখিতেছি, সে সীমা লঙ্ঘন করিতে এতটুকু লজ্জা অনুভব করেন না।

জিন্না সাহেব বেশ ভাল করিয়াই বুঝেন যে, পাকিস্থান কোনও দিনই হইবে না। নানা কারণে ইহা অসম্ভব। ইহার পথে এমন কতকগুলি বাস্তব বাধা আছে যে, সেইজন্য কোনও দিনই পাকিস্থান রূপ গ্রহণ করিবে না। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বাধা ত আছেই, তদুপরি আছে বৃটিশ সরকার ও অ-মুসলমান অঞ্চল হইতেও প্রবল বাধা। ব্রিটিশ সরকার নিজেদের রাজনৈতিক প্রয়োজনের জন্য এতদিন মুসলিম স্বার্থ লইয়া অনেক

খেলা খেলিয়াছেন। পৃথক নির্ব্বাচন, বিশেষ দায়িত্ব, বাঁটোয়ারা প্রভৃতি উপায়ে ভারতের রাজনীতির অগ্রগতিকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা পাকিস্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ ইহাতে তাঁহাদেরও বিশেষ বাধা আছে। অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের অমতেই বা কেমন করিয়া পাকিস্থান সম্ভব হইবে? সাম্প্রদায়িক স্বার্থের নামে এতদিন যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে বহু অ-মুসলমানের মত লইয়াই হইয়াছে। কিন্তু পাকিস্থান ব্যাপারে কোন অ-মুসলমানই একমত নহে। পূর্ব্বে সামান্য একটু আধটু চাকরী বাকুরী ও অন্যান্য বিশেষ সুবিধার লোভ দেখাইয়া বহু অ-মুসলমানকে সাম্প্রদায়িক দলে ভিড়াইয়া লওয়া সম্ভব হইয়াছে। এখন গোটা দেশকেই খণ্ডে খণ্ডে বিভাগ করিতে কেহই সম্মত হইবে না। এক তরফা দাবী করিলে কেমন করিয়া পাকিস্থান সম্ভব হইবে? সুতরাং পাকিস্থানের আশা সুদূর পরাহত। হিন্দুসভা পাকিস্থানের বিরুদ্ধে তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া সংগ্রাম করিবেন। মডারেট ও লিবারেলগণ ইহার বিরোধিতা করিবেন। শিখ, দেশীয় খৃষ্টান ও অনুন্নত হিন্দুগণ তারস্বরে ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন। একদিকে অধিকাংশ মুসলমান পাকিস্থানের বিরোধী, আর অন্যদিকে সমগ্র অ-মুসলমান পাকিস্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে কৃতসঙ্কল্প। এরূপ ক্ষেত্রে মিঃ জিন্না প্রমুখ কতকগুলি মুষ্টিমেয় ব্যক্তির অব্যবস্থিত মনের আবদার রক্ষা করিবার জন্যই কি এই অখণ্ড ভারত দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইবে? দুঃস্বপ্ন আর কাহাকে বলে? সুতরাং পাকিস্থান কোন অবস্থায় কোনও দিনই সম্ভব হইবে না। তবে এই ভূয়া আদর্শকে লইয়া কেন এত আন্দোলন করা হইতেছে? ইহার

দ্বারা জিন্না সাহেব কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধন করিতে চান। মুসলমানের কল্যাণ অপেক্ষা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থই ইহার দ্বারা অধিকতর লাভবান হইবে। সঙ্গে সঙ্গে জিন্না সাহেবের ক্ষীয়মান প্রভাব প্রতিপত্তি নূতন করিয়া জাঁকিয়া উঠিবে। দেশের মুক্তি আন্দোলনকে প্রতিহত করিবার জন্য যে ভেদনীতির প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল, সেই ভেদনীতির বিষক্রিয়া দেশের মর্ম্মমূলে প্রবেশ করাইবার অভিসন্ধিও ইহার মধ্যে নিহিত আছে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হইয়া যাহাতে সাম্প্রদায়িক সংহতি প্রবল হইয়া উঠে, সেইজন্য পাকিস্থানের প্রতি এত জোর দেওয়া হইতেছে। অন্যান্য সমস্ত কৌশলের ক্ষেত্র ফুরাইয়া গিয়াছে। এক্ষণে অত্যন্ত চতুরতার সহিত এই নূতন কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমাদের এত অনৈক্যের মধ্যে তাঁহারা কেমন করিয়া শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের কথা চিন্তা করিবেন ? সুতরাং পাকিস্থান আন্দোলন দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য-বাদেরই জয় হইল। পাকিস্থান আন্দোলন যদি সমগ্র অ-মুসলমানকে সঙ্ঘবদ্ধ করে এবং মুসলমানের বিরোধী করিয়া তুলে, তবে তাহাতে মুসলমানের কি লাভ হইতে পারে, তাহা প্রত্যেক মুসলমানকে চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি।

দ্বিখণ্ডিত ভারতের নিরাপত্তা

ডাক্তার সৈয়দ আবদুল লতিফ সাহেব ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিবার যে পরিকল্পনা দেশবাসীর সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন ইতিপূর্ব্বে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। যদি তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে ভারতবর্ষ, হিন্দু-ভারত ও মুসলিম-ভারত এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং ব্রিটিশ সরকার তাহাতে সম্মতি দেন, তাহা হইলে ভারতের অবস্থা কি হইতে পারে তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ভারত বণ্টনের এই পরিকল্পনার সুবিধা ও অসুবিধার দিকগুলিকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে আলোচনা করিতে হইবে এবং তারপর উহার মীমাংসার ভার দেশবাসীর বুদ্ধি বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে। বর্ত্তমান ভারতবর্ষ সর্ব্বতোভাবে পরাধীন। ব্রিটিশ ডোমিনিয়ানের যে স্বাধীনতা আছে ভারতের তাহা পর্য্যন্ত নাই। অতীতে ব্রিটিশ সরকারের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাতে ভারতবাসী কোনওরূপ রাজনৈতিক অধিকার পায় নাই। যতটুকু অধিকার তাহারা পাইয়াছে, তাহা সম্ভব হইয়াছে আন্দোলন করিয়া, সংগ্রাম করিয়া ও অসহ্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া। সুতরাং ভবিষ্যতে সংগ্রাম ব্যতীত কোনওরূপ অধিকার পাওয়া যাইবে না, ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। ভারত যে দ্বিখণ্ডিত হইবে সে কবে? আজি কালি, না সংগ্রাম দ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর? ডাক্তার লতিফ সাহেব স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের কোনওরূপ পরিকল্পনা বা কর্ম্মপদ্ধতি দেন নাই।. সুতরাং ধরিয়া লইতে

হইবে যে, তিনি স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বেই ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিতে চান। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বেই ভারতবর্ষ যদি দ্বিখণ্ডিত হয়, তবে দুই অংশের উপরই ব্রিটিশ শক্তি প্রভুত্ব করিতে থাকিবে। আজ অখণ্ড ভারতে জাতির সমবেত শক্তি ও চেষ্টার দ্বারা যে সংগ্রাম সফলতার মুখ দেখিতে পাইতেছে না, দ্বিখণ্ডিত ভারতে কি সেই সংগ্রাম যথোপযুক্ত ভাবে পরিচালিত হইতে পারিবে? এক দিকে মুসলিম ভারত, আর অন্য দিকে হিন্দু ভারত—এই দুই দেশ বিভক্ত হইয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং কতকটা রেশারেশির ভাব লইয়া কেমন করিয়া স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাইবে? আর চালাইতে গেলে সে সংগ্রাম যে সহজেই প্রশমিত হইয়া যাইবে। কেহ ধমকী হুমকীতে আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে, আবার কেহ প্রলোভন ও তোয়াজে নিৰ্জ্জীব হইয়া পড়িবে। দ্বিখণ্ডিত ভারত কোন মতেই স্বাধীনতার সংগ্রাম করিতে পারিবে না। সে সংগ্রাম আরম্ভ হইবামাত্রই অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর হিন্দু-মুসলমানের সুবিধার নামে উভয় সম্প্রদায়ের সম্মতিক্রমে যদি ভারতবর্ষ উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়, তবুও উহা ভারতের পক্ষে শুভকর হইবে না। দ্বিখণ্ডিত ভারতের শক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। তাহার দুর্ব্বলতা পদে পদে ধরা পড়িবে। অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃ শত্রুর আক্রমণ এই দুই প্রকার বিপদের সম্মুখে ভারতকে চিরকালই বাস করিতে হইবে। প্রথমে অন্তর্বিপ্লবের কথা বলিব। দুই তিনটি কারণে হিন্দু-ভারত ও মুসলমান-ভারতের মধ্যে দিনরাত কলহ লাগিয়া থাকিবে। প্রথম হইতেছে এই দুই রাজ্যের সীমান্ত

লইয়া। দুই স্বতন্ত্র রাজ্যের সীমান্ত সমস্যা খুব সোজা ব্যাপার নহে। অতীত কালে প্রত্যেক রাজ্যে এই সমস্যা লইয়া নানা সংগ্রাম হইয়াছে। ক রাজ্য লোপ পাইয়াছে এবং কত রাজ্য অপরের দাস হইয়াছে; এবং বহু রাজ্যের সীমা রেখা লইয়া এখনও গণ্ডগোল চলিতেছে। দ্বিখণ্ডিত ভারতে যদি এই লইয়া মন কষাকষি চলিতে থাকে, তবে তাহা ব্যাপক সংগ্রামে পরিণত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। সেই সময় সুযোগ বুঝিয়া অন্য কোন সবল জাতি ভারতকে আবার পদানত করিবে। অথবা কিয়দংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে। ব্যবসায়, বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ হইবার সম্ভাবনা খুব কম নহে। এই প্রকার বিবাদ বাধিবার উপক্রম হইলে, তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অন্য কোন শক্তির সহিত গোপন সন্ধি ও চুক্তির প্রাবল্য বাড়িয়া যাইবার আশঙ্কাই অধিক হইবে। সামান্য সামান্য ব্যাপার লইয়া উভয় রাজ্যের মধ্যে সংগ্রাম হইতে থাকিবে। হিন্দু ভারতের কিয়দংশ মুসলমানগণ কাড়িয়া লইবে, সেইরূপ মুসলিম-ভারতও হিন্দুদের আক্রমণ হইতে নিরাপদ রহিবে না। এই সব সংগ্রাম যখন হইতে থাকিবে তখন কি অন্য জাতি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে? তাহারা কখনও মুসলমানের সহিত যোগ দিবে, কখনও হিন্দুর কণ্ঠলগ্ন হইবে এবং ধীরে ও কৌশলে ভারতবর্ষকে আবার আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তখন ভারত বহুখণ্ডে বিভক্ত ছিল। হিন্দু, মুসলমান, মারাঠা, শিখ, জাঠ, রাজপুত এইসব শক্তি এক একটা এলাকায় স্বাধীন

রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনওরূপ সহযোগিতা ছিল না, একে অপরের সহিত যুদ্ধ করিত। কখন দুই শক্তি একত্র মিলিত হইয়া অন্যের সর্ব্বনাশ করিত, কখন কখন রাজ্য লইয়া চারিদিকে সংগ্রাম বাধিয়া যাইত। মারাঠাগণও শেষ পর্য্যন্ত একতাবদ্ধ থাকিতে পারে নাই। তাহাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রভুত্ব লইয়া দিনরাতই কলহ হইত। এই সময় ব্যবসায় উপলক্ষে ইউরোপীয়গণ এদেশে আসিয়া এই সকল গৃহ-যুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল। বিশেষতঃ ফরাসী ও ইংরাজগণ বিবদমান দুই দলের কোন একটাতে যোগ দিয়া আপনাদের কার্য্য সিদ্ধি করিয়া লইত। শেষ পর্য্যন্ত ফরাসীগণ ইংরাজের নিকট টিকিতে পারিল না; সুতরাং ইংরাজগণ ভারতে শক্তির সমতা রক্ষা করিতে রহিয়া গেলেন। এই শক্তির সমতা তাঁহারা অপূর্ব্বভাবে রক্ষা করিলেন। তাঁহাদের কৌশলে হায়দার আলি, মারাঠা জাতি ও নিজাম কোন দিনই এক হইতে পারেন নাই। তাঁহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়াই নিজেদের সর্ব্বনাশ আনয়ন করিলেন। শেষে রহিল মারাঠা-শক্তি। ইহারা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল এবং সর্ব্বদাই পরস্পর ঝগড়া করিত। ইহাদের একটিকে অপরটির বিরুদ্ধে লাগাইয়া দিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। এইভাবে কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে এবং পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে ভারতবর্ষ অনায়াসে ব্রিটিশ শক্তির নিকট নত হইল। পাঞ্জাবে ঠিক এইভাবে শিখ-শক্তি ও মুসলমান-শক্তি বিনষ্ট হয়। হিন্দু ভারত ও মুসলিম ভারতের মতই সে যুগে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে অনেকগুলি রাজ্য ছিল। কিন্তু মিলন ও সহযোগিতার অভাবে তাহারা টিকে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর করুণ ইতিহাস আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে,

ভারতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাজ্য গঠন করিতে গেলে দেশের স্বাধীনতা থাকিবে না, দেশ অনায়াসে বিদেশী শক্তির পদানত হইয়া পড়িবে।

চক্ষের সম্মুখে এই উদাহরণ বিদ্যমান থাকিতে কোন্ যুক্তির বলে আজ লীগপন্থীগণ ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিতে চান তাহা আমরা বুঝি না। এরূপ করিতে গেলে ভারতবর্ষে পুনরায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হইবে। আজ এসিয়া ও ইউরোপের বড় বড় জাতিগুলি চারিদিকে রাজ্য বিস্তারের ফিকিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত সভ্য জগতের সম্মুখে ইতালী বিনা দোষে বিশ্বের সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া আবিসিনিয়া দখল করিয়া বসিল। তেমনিভাবে জার্ম্মাণ সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিল। জাপানও ঠিক সেইভাবে চীন দেশকে উদরস্থ করিতেছে। এই সব জাতির দৃষ্টি কি ভারতের উপর নাই ? দ্বিখণ্ডিত ভারত যখনই সামান্য ব্যাপার লইয়া গণ্ডগোল করিতে থাকিবে, তখনই তাহারা কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া আবার ভারতকে পদানত করিবে। এই অবস্থার কথা কি লীগ-পন্থীগণ একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই ? ভারত দ্বিখণ্ডিত হইলে সে আত্মরক্ষার সমস্ত শক্তি হারাইবে। একজাতীয়তাবোধ তাহার কখনও হইবে না, একের বিপদে অপরে আসিবে না, বরং সেই বিপদকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিবে। দেশের ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প কৃষি—সবই অনিশ্চিয়তার মধ্যে পতিত হইবে। যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের অজুহাতে মুসলমানগণ ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিতে চাহিতেছেন, সেই স্বার্থই প্রতি পদে ক্ষুণ্ণ হইবে।

কালনেমির লঙ্কাভাগের মত ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিবার কথা লীগ পন্থীদের কল্পনা রাজ্যে বিরাজ করিতে পারে। কিন্তু তাহাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে ভারতের নিরাপত্তা চিরকালের তরে দূর হইয়া যাইবে। বিস্তুবিয়সের অগ্নুদ্গারের মুখে গোটা দেশটাকে রাখিয়া দিলে হঠাৎ কোন সময় বিপদ আসিয়া ভারতের স্বাধীনতাকে বিলীন করিয়া দিবে। কি পরাধীন অবস্থায়, কি স্বাধীন অবস্থায় কোন সময়ই ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিবার কল্পনা করা পাপ। অখণ্ড ভারতই দেশকে স্বাধীন করিবে, এবং ভারতের এই অখণ্ডতাই দেশের অর্জ্জিত স্বাধীনতাকে সকল বাধা-বিঘ্ন লঙ্ঘন করিয়া রক্ষা করিতে পারিবে। আজ দেশের মহাদুর্দ্দিন আসিয়াছে বলিতে হইবে; তাহা না হইলে সামান্য একটা গানবাজনা ও গো-বধের সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া দেশের কতকগুলি শিক্ষিত লোক জিদের বশে এমন কল্পনা করিতে পারে, যাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইবে ভারতের চির দাসত্ব। আশা করি ভারতের মুসলমান সমাজ ডাঃ লতিফের প্রস্তাব দ্বারা বিভ্রান্ত হইবেন না। একটা অন্ধ মানসিকতা হইতে লতিফ সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত সুবুদ্ধি মুসলমানের আছে। হাজার সুবিধার লোভ দেখাইলেও মুসলমান ভারতকে এইভাবে খণ্ডিত হইতে দিবে না, ভারতের নিরাপত্তার মূলে কুঠারাঘাত করিবে না।



যে ভয় করিতেছেন, হিন্দু রাষ্ট্রেও ত সেই ভয় থাকিয়া যাইবে। কোন্ সাহসে তাঁহারা তিন কোটি মুসলমানকে হিন্দু রাষ্ট্রের অধীনে ছাড়িয়া দিবেন? আজ তাঁহারা যে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন, তখনও ত সেই ভয়ই থাকিবে। লীগের দৃষ্টিতে হিন্দুরা অবিশ্বাসের পাত্র। বেশ তাহা মানিলাম। যদি বুঝিতাম অধিবাসী বিনিময় পাকিস্থানের প্রধান সর্ত্ত, তাহা হইলে এই ভয় কতকটা অপনীত হইত। কিন্তু এখন দেখিতেছি অধিবাসী বিনিময় তাঁহারা চান না। তাঁহারা মুসলিম-প্রধান দেশগুলিতে মুসলিম-রাষ্ট্র গঠন করিতে চান। হিন্দু-প্রধান দেশে যে সব মুসলমান আছে, তাহাদের ভাগ্য কি হইবে? তাহাদের শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুদের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে। ভারতে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় আট কোটি। ইহার মধ্যে প্রায় তিন কোটি মুসলমান হিন্দু-প্রধান দেশে বাস করে। এই তিন কোটিকে অত্যাচারী হিন্দুদের উপর ছাড়িয়া দিয়া বাকী পাঁচ কোটি মুসলমান লইয়া লীগওয়ালারা সুখে রাজত্ব করিবেন। আর তাহারই জন্য সমগ্র ভারতের মুসলমানকে প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে হইবে! বেশ মজার কথা বটে!

ভারতের কয়েকটি প্রদেশে হিন্দু-প্রাধান্যের কারণে মুসলমানের উপর অত্যাচার হইতে পারে এবং বহু বিষয়ে বিশেষতঃ সংস্কৃতি, সভ্যতা, ধর্ম্ম ও সাহিত্য বিষয়ে অসুবিধা হইতে পারে, এই ভয়ে পাকিস্থান পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হিন্দু-প্রধান প্রদেশের মুসলমানের রক্ষার কোন ব্যবস্থা উক্ত পরিকল্পনায় নাই। দুই চারিটা স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হইলে কি হিন্দুরা মুসলমানের উপর অত্যাচার করিতে ছাড়িয়া

দিবে ? • হিন্দু রাষ্ট্রে তিন কোটি মুসলমানের কি অবস্থা হইতে পারে, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের মত স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্রে হিন্দুরাই ত আইনকানুন প্রণয়ন করিবে। নগণ্য মুসলিমের মতামত সেখানে গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। স্বাধীন রাষ্ট্রে মেজরিটি হিন্দুর মতই প্রবল হইবে। সেখানে কতকগুলি রক্ষাকবচ কোনরূপে কার্য্যকরী হইবে না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ভেদনীতিমূলক আইন পাশ করাইয়া লইতে কেহই বাধা দিতে পারিবে না। ভারত ব্যবচ্ছেদের যদি এই পরিণাম হয়, যদি এইভাবে তিন কোটি মুসলমানকে হিন্দুদের দাসানুদাসে পরিণত করাই পাকিস্থানের শেষ পরিণতি হয়, তবে উহা মুসলমানের জন্য বেহেস্তের কোন্ "নিয়ামত" (কল্যাণ) আনিয়া দিবে ? পাকিস্থান পরিকল্পনার মাথাওয়ালা পণ্ডিতগণ হিন্দু রাষ্ট্রের তিন কোটি মুসলমানের কথা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। দেখিলে তাঁহারা কখনও এই প্রকার খামখেয়ালী প্রস্তাব করিতেন না। এই সর্ব্বনাশী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার সময় জিন্না সাহেব সমগ্র ভারতের মানচিত্রখানি ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই। ভারতের কোন্ অঞ্চল সমৃদ্ধিশালী, কোন্ অঞ্চল উর্ব্বর বা খনিজসম্পদে পরিপূর্ণ, তাহাও ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই। তাড়াতাড়ি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার অভিলাষে তিনি সকল দিক ভাবিয়া দেখেন নাই। তাঁহার পরিকল্পিত মুসলিম রাষ্ট্র এমন কতকগুলি দেশ লইয়া গঠিত হইবে, যে স্থানকে সকল দিক দিয়া সমৃদ্ধিশালী দেশ বলা যাইতে পারে না। খনিজসম্পদের মধ্যে দু'একটি স্থানে কিঞ্চিৎ কয়লা পাওয়া যাইবে। অবশিষ্ট খনিজসম্পদ হিন্দু রাষ্ট্রের অন্তর্গত হইবে। একদিকে খনিজসম্পদের বাহুল্যে

হিন্দুরা দিন দিন অর্থশালী হইতে থাকিবে, আর অন্যদিকে তদভাবে মুসলমানগণ নিঃস্ব হইয়া দীনহীনভাবে জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইবে। আরবের যাযাবর জাতির উত্তরাধিকারিগণ আবার পূর্ব্বপুরুষদের বৃত্তি অবলম্বন করিবে। ভারতের চারিদিকে পাঠান ও মোগল সভ্যতার বিবিধ নিদর্শন ছড়াইয়া রহিয়াছে। আজিও যুক্তপ্রদেশ ও বিহারকে মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে ; কিন্তু ভারত ব্যবচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে এইসব স্থান হিন্দুদের কবলিত হইয়া যাইবে। দেওবন্দ, শাহারানপুর, দিল্লী, মীরাট, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, আলীগড় প্রভৃতি স্থান হিন্দুদের হস্তগত হইবে। বিহারের বহু তীর্থভূমি, আজমীঢ়ের খাজাবাবার মাজার হিন্দুদের দ্বারা শাসিত হইবে। হিন্দুরা অত্যাচারী এই অছিলায় এই পরিকল্পনার সৃষ্টি। কিন্তু ব্যবচ্ছেদ হইয়া যাওয়ার পর এই সব স্থানের গুরুত্ব কমিয়া যাইবে। হিন্দুরা এগুলিকে কবলিত করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তুলিতে পারে। এইভাবে মুসলিম সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অংশগুলিকে হিন্দুদের রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া পাকিস্থানের আদর্শ কিরূপে রক্ষিত হইবে, তাহা আমরা বুঝি না। মোটের উপর কথা এই যে, স্বাধীন মুসলিম-রাষ্ট্র পাইয়াও মুসলমানের কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না। হিন্দু-রাষ্ট্রে মুসলমানের উপর জুলুম, অথবা মুসলিম রাষ্ট্রে হিন্দুর উপর জুলুম ভারতের এই কলঙ্কময় কাহিনীর শেষ হইবে না। আজ যে সাম্প্রদায়িক কলহ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা ভারতের শান্তি-সুখের ব্যাঘাত ঘটাইতেছে, সেদিনও তাহাই হইবে। সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিবে। আজ অনেকের মনে সর্ব্বভারতীয় সংহতির আদর্শ জাগিয়া আছে, তাহারা সতত সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও সদ্ভাবের জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু

সেদিন সেরূপ কোন দল থাকিবে না। হিন্দু মুসলমানের সমস্যাটা অহিনকুলের মত হইয়া উঠিবে। এক সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া সহস্র সমস্যা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে এবং পরিশেষে বৈদেশিক শক্তি আসিয়া সমগ্র দেশটাকে কুক্ষিগত করিয়া লইবে। পাকিস্থান পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ভারতের স্বাধীনতা পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইতে থাকিবে। ভারতকে চিরপদানত করিয়া রাখাই যদি জিন্না সাহেবের আসল উদ্দেশ্য হয়, তবে বলিব যে, তিনি যথাসময়ে যথা কাজ করিয়াছেন। কিন্তু স্বাধীনতা যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বলিব, এমন স্বাধীনতানাশী অদ্ভুত পরিকল্পনা, এ পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

ভারতে জাতিত্ব সমস্যা

ভারতীয় মুসলমানের স্বার্থ বলিতে যে ঠিক কি বস্তু বুঝায় তাহার কোন স্পষ্ট ধারণা এতাবৎ কেহই দিতে পারে নাই। সেই জন্য আমাদের নেতারা প্রয়োজন মত মুসলিম স্বার্থ নামক মাকাল ফলকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। এতদিন ধারণা ছিল যে, চাকুরী-বাকুরীর একটা মোটা অংশ তাঁহাদের জন্য বরাদ্দ হইলেই মুসলিম স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রহিবে। কিন্তু এখন সে ধারণা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আর চাকুরী-বাকুরীতে তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। এখন তাঁহারা চাহেন অন্য ব্যবস্থা। ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত একত্র হইয়া তাঁহারা আর থাকিতে চাহেন না। তাঁহারা চান স্বাতন্ত্র্য। মুসলমানগণ একটা স্বতন্ত্র জাতি, অপরের সহিত তাঁহাদের মিলন ও সদ্ভাব ত সম্ভবই নয়, এমন কি এক সঙ্গে একই দেশে আর বাস করা চলিবে না। তাঁহাদের জন্য ভারতের কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে হইবে। সেইখানে তাঁহারা স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে বাস করিবেন। নতুবা তাঁহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবেন না। সম্প্রতি মুসলিম লীগের পররাষ্ট্র বিভাগ ও শাসনতন্ত্র রচনা বিভাগের একটি যুক্ত অধিবেশনে মুসলমানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা স্থির হইয়াছে। তাহাতে তিনটি দাবী সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। যথা :—(১) ভারতীয় মুসলমানগণ একটি স্বতন্ত্র জাতি। (২) তাহাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র জাতীয় "আবাসভূমি" National Home) গঠন করিতে হইবে এবং (৩) তাহাদের এই

দাবী পূরণ না হইলে মুসলমানগণ শাসনতন্ত্র গ্রহণ ত করিবে না, বরং সমস্ত শক্তি দিয়া উহাতে বাধা দিবে।

বিভিন্ন দিক দিয়া এই দাবীর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে—ইহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত এবং মুসলিম স্বার্থের পক্ষে কতদূর উপযোগী। ভারতে মুসলমান ব্যতীত আরও কতিপয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় বাস করে। তাহাদের ধর্ম্ম ইসলাম; ও তাহা হিন্দু ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন। ধর্ম্মই যদি জাতি গঠনের মূল ভিত্তি হয়, আর ধর্ম্মের জন্য যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে মুসলমানের দাবী একা স্বীকার করিলে চলিবে কেন? মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে হইলে, অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যও স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। তাহাদিগকে ভারতের বুকে একটা একটা করিয়া এমন স্থান দিতে হইবে, যেখানে তাহারা অপর সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। ভারতে হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, শিখ, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, আদিবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র আবাস ভূমি করিয়া দিতে হইবে। এক একটা অঞ্চলে এক একটা জাতি পরম শান্তিতে ও নির্ব্বিঘ্নে স্ব স্ব স্বাধীনতা ভোগ করিতে থাকিবে। কিন্তু এইভাবে যদি ভারতভূমি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়, তবে ভারতের আর থাকিল কি? সমগ্র ভারত, অখণ্ড ভারত এসব আদর্শ তাহা হইলে কথার কথাতেই পর্য্যবসিত হইবে। তাহা না হয় হইল; কিন্তু এইভাবে স্বতন্ত্রীকৃত ভারত কি কোনওদিন বহির্দ্দেশের প্রবল শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে?—অথবা বর্ত্তমান ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব হইতেও মুক্তিলাভ করিতে পারিবে? সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বণ্টনের শেষ পরিণতিতে সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন আরও দৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য হইয়া পড়িবে। আজ অখণ্ড ভারতের আদর্শের উপর দাঁড়াইয়া সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতা, সাহচর্য্য ও অক্লান্ত চেষ্টায় যাহা সম্ভব হইতেছে না, শতধা বিভক্ত হইয়া এক একটি সম্প্রদায় কেবলমাত্র নিজস্ব চেষ্টায় কি তাহা সফল করিতে পারিবে? কোন বাতুলও বোধ হয় এরূপ কল্পনা করিতে পারে না। খণ্ড খণ্ড ভারত চিরকাল অপরের দাস হইয়া রহিবে।

হয় ত মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায় এই প্রকার স্বাতন্ত্র্য দাবী করিবে না। তাহারা ঘৃণাভরে ইহা প্রত্যাখ্যান করিবে। আর করিতেছেও তাহাই। মুসলমানের এই দাবী যদি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহাদের লাভালাভের দিকটাও ত একবার যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। ইহাতে কি বাস্তবিকই তাহারা লাভবান হইবে? আমাদের বিশ্বাস, ইহাতে মুসলমানের কোন লাভ হইবে না। বরং এই দাবীর পূরণ হইলে তাহারা চিরকাল নিজ বাসভূমে পরবাসী হইয়া থাকিবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুসলমানগণ কি করিতেছে তাহা এইস্থলে একবার ভাবিয়া দেখা দরকার। আরব, মিসর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, পারস্য প্রভৃতি দেশে মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। তুর্কী সুলতানের আমলে মুসলমানগণ মনে করিত তাহারা রাজার জাতি। আর খৃষ্টান, ইহুদী প্রভৃতি অ-মুসলমানগণ মনে করিত তাহারা তুরস্কের দাস। সেই জন্য কোনওদিনই সেই সব দেশে সত্যিকারের জাতীয় জাগরণ হইতে পায় নাই। তাই মুসলমান ও অ-মুসলমানের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপিত হইতে পায় নাই। কিন্তু মহাসমরের পর যখন এই সব

দেশ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের কবলে পতিত হইল, তখন হইতে তাহারা জাতীয়তার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিল। সাধারণ বিপদ তাহাদিগকে নিকটতর করিতে লাগিল। সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ক্রমে দূরীভূত হইতে লাগিল। এই সময় যদি তাহারা মিঃ জিন্না পরিকল্পিত স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিত, তাহা হইলে সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপ অবিলম্বে সে দাবী স্বীকার করিয়া লইত। কারণ তাহাতে সাম্রাজ্যবাদেরই ষোল আনা লাভ হইত। কিন্তু তথাকার বিচক্ষণ মুসলমানগণ তাহা করিলেন না। তাঁহারা অ-মুসলমানদের সহায়তা ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলেন। কারণ তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা না পাইলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অসম্ভব ছিল। মাইনরিটি অ-মুসলমানগণও দেশের এই দুঃসময়ে স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিল না। দাঁও বুঝিয়া সুবিধা আদায়ের কথা চিন্তাও করিল না। স্বতন্ত্র স্বার্থের কথা ভুলিয়া তাহারা মুসলমানের সহিত সহযোগিতা করিয়া দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিল। সর্ব্বপ্রথম সম্মিলিত সংগ্রাম আরম্ভ হইল ফরাসী কবলিত সিরিয়াতে। তথাকার ড্রুস খৃষ্টানদিগকে হাত করিবার জন্য ফরাসী সরকার বহু চেষ্টা করিয়াছিল। দুএকটি দলকে হাতও করিয়া ফেলিল। কিন্তু অবশিষ্ট খৃষ্টানগণ মুসলমানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিল। তাহারই ফলে আজ সিরিয়া অনেকটা ফরাসীর প্রভাব মুক্ত হইতে পারিয়াছে। প্যালেষ্টাইনে আজ যে জাতীয় আন্দোলন হইতেছে তাহাতে মুসলমান ও খৃষ্টান প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এই সব দেশের মুসলমানগণ নিজদিগকে প্রথমেই মুসলমান ভাবে না। তাহারা জাতি হিসাবে সিরিয়াবাসী অথবা

প্যালেষ্টাইনবাসী—এইভাবেই নিজেদের পরিচয় দেয়। মিঃ জিন্নার মত তাহাদের প্রাণে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিলে আজ নিকট-প্রাচ্যে জাতীয়তা ও স্বাধীনতার নামগন্ধ কেহ পাইত না। মিসরের অ-মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বোধ জাগাইবার বহু চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা তাহাতে বিভ্রান্ত হয় নাই। পারস্যের রেজা শাহ পহ্লবী উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, পারস্যে একটি মাত্র জাতি আছে, আর সে জাতি হইতেছে পারস্যবাসী। মুসলমানের মনে পাছে কোন প্রাধান্য বোধ জাগে, সেই জন্য তিনি পারস্যের আধুনিক নাম পরিবর্ত্তন করিয়া প্রাচীন পৌত্তলিক যুগের "ইরাণ" এই নাম দিয়া পারস্যকে জগতের নিকট পরিচিত করাইতেছেন। চীন দেশে প্রায় পাঁচ কোটি মুসলমান বাস করে। তাহারা কোনদিন স্বতন্ত্র জাতীয় বাসভূমি দাবী করে নাই। অন্যান্য চীনাদের সহিত যুগ যুগ হইতে পাশাপাশি একই সঙ্গে বাস করিয়া আজ তাহারা চীন জাতির একটা প্রধান অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। চীনারা বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান এই নামে জগতকে পরিচয় দিতে চাহে না। তাহারা চীনাম্যান বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। সর্ব্বশেষ উদাহরণ নবজাগ্রত তুরস্ক। সেখানে আইন করিয়া ধর্ম্মকে রাষ্ট্র হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। তুরস্কের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রধান গর্ব্ব যে, তাহারা তুর্কী। তথাকার অ-মুসলমানগণ যদি মিঃ জিন্নার মত স্বাতন্ত্র্য দাবী করে, তাহা হইলে তুরস্কের গর্ব্ব ও মহিমা একদিনেই ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। যদি অন্যান্য দেশের মুসলমানগণ, অ-মুসলমানের সহিত একই সঙ্গে একই জাতির নামে বাস করিতে পারে, তবে ভারতের মুসলমানগণ কেন তাহা পারিবে না? ভারতীয় মুসলমানগণ কি খোদার খাস বান্দা যে, অপরের স্পর্শ পাইলে

তাহাদের ইহকাল পরকাল নষ্ট হইয়া যাইবে? বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমন্বয়ে একটি জাতি গঠন করা ও সেই নামে পরিচিত হওয়া ইসলামের আদর্শের বিপরীত নয়, বরং মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস হইতে দেখা যাইবে যে, মুসলমানগণ বরাবর সেই প্রকার জাতীয়তা গঠনে সহায়তা করিয়াছেন। হজরত মহম্মদের যুগে 'আরবী' ও 'আজমী' বলিয়া যে দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হইত, তাহা আরববাসী ও আরবের বহির্ভূত অন্যান্য দেশের অধিবাসীকেই বুঝাইত। এখনও ভারতের মুসলমান আরবে গেলে তাহাকে 'আজমী' বলে; এবং আরবের খৃষ্টান ভারতে আসিলে তাহাকে আমরা 'আরবী' বলিয়া থাকি।

মুসলমানের কল্যাণের নামে আজ জিন্না সাহেবের চক্ষে নিদ্রা নাই। কিন্তু তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই যে, ভারতীয় মুসলমানের "স্বতন্ত্র জাতিত্বে"র আদর্শ ভারতীয় মুসলমানকে চিরকালের তরে গৃহহারা করিয়া দিবে। ইউরোপ হইতে আমদানী করা ইহুদীগণ প্যালেষ্টাইনে আজ যে দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছে, স্বতন্ত্র "ন্যাশন্যাল হোমে" বাস করিয়া মুসলমানগণও সেইরূপ অসুবিধায় পতিত হইবে। চারিদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু, তাহারই মধ্যে দুএক জায়গায় মুসলমানের জাতীয় আবাসভূমি—ইহা মুসলমানের সুখ-শান্তি বিনাশেরই কারণ হইবে। পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দু রাষ্ট্রের সহিত মুসলিম রাষ্ট্রের সখ্যতা হইবে না এবং সেই সুযোগে কোন বৈদেশিক প্রবল শত্রু মুসলিম রাষ্ট্রকে ও হিন্দু রাষ্ট্রকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগাইয়া নিজেদের প্রাধান্য কায়েম করিয়া লইবে। ইহাতে কি মুসলমানের কিছুমাত্র লাভ হইবে? ঘরের "শত্রুর" হাত হইতে বাঁচিতে গিয়া প্রবলতম শত্রুর হাতে

গিয়া পড়িবে। কিন্তু আশার কথা এই যে, জিন্না সাহেবের স্বতন্ত্র জাতির দাবীটাকে ভারতীয় মুসলমানগণ স্নেহের চক্ষে দেখে নাই। বরং চারিদিক হইতে যে ভাবে তাহার প্রতিবাদ হইতেছে তাহাতে মনে হয়, অবিলম্বে এই প্রকার ছেলেমানুষী জিন্না সাহেবকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের হিন্দু মুসলমানের সাময়িক বিরোধকে আরও ঘনীভূত করিবার উদ্দেশ্যেই জিন্না সাহেব এই দাবী করিয়াছেন। ভবিষ্যতের নবজাগ্রত মুসলমান কখনও জিন্না সাহেবকে ক্ষমা করিবে না। তাহারা জানিবে—যখন সাম্প্রদায়িক মিলনের চেষ্টা হইতেছিল ত্যাগের দ্বারা, ভালবাসার দ্বারা, যখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রাণের অদল বদল হইতেছিল, সে সময় জিন্না সাহেব সর্ব্বদাই ঘোরাল পেঁচাল আচরণ দ্বারা ভারতের শান্তি ও সদ্ভাব নষ্ট করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। জিন্না সাহেবের বর্ত্তমান আচরণ ইসলামের মান-মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছে।

ভারতে দ্বিতীয় প্যালেষ্টাইন

বিগত মহাসমরের পূর্ব্বে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে নানা রাষ্ট্রের মধ্যে প্রাচীন য়িহুদী সম্প্রদায় ছড়াইয়া ছিল। নিজের বলিতে তাহাদের কোন দেশ ছিল না, কোন রাষ্ট্র ছিল না, তাহাদিগকে বাস করিতে হইত অপরের দেশে, অপরের মর্জ্জির উপর নির্ভর করিয়া। এই জন্য বহু দিন হইতে একদল য়িহুদি পৃথিবীর উদার বুকে এমন একটি স্থান অন্বেষণ করিতেছিল যেখানে তাহারা নির্ব্বিঘ্নে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করিতে পারে। য়িহুদীদের আদি ভূমি প্যালেষ্টাইনের উপর তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। য়িহুদীদের বহু ধনকুবের মহাসমরে মিত্রপক্ষকে, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডকে বিস্তর সাহায্য করিয়াছিল। তাহারই বিনিময়ে তাহারা প্যালেষ্টাইনে "জাতীয় আবাসভূমি" লাভ করিবার প্রতিশ্রুতি পাইল। এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্যালেষ্টাইনের মত একটা ধনসম্পদপূর্ণ দেশ য়িহুদীদের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। নানা দেশ হইতে হাজার হাজার য়িহুদী আসিয়া এই দেশে বসতি বিস্তার করিতে লাগিল। সাম্রাজ্যবাদের আওতায় থাকিয়া তাহারা স্থানীয় আরবদের বাধা প্রতিবন্ধক অগ্রাহ্য করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা চাহিয়াছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। তাহার ফলে তাহারা পাইল এমন একটা দেশ যাহা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য না পাইলে রক্ষা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। আর পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে তাহারা পাইল এমন একটা দলবদ্ধ শত্রু যাহারা অহর্নিশ তাহাদের শান্তি-সুখের ব্যাঘাত করিতে লাগিল।

বস্তুত স্বদেশের সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত আরবদের প্রতিবন্ধকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। জাতীয় "হোম" পাইয়াও য়িহুদীগণ কোন স্বস্তি পাইতেছে না। নিতান্ত অশান্তির মধ্যে তাহাদের দিন কাটিতেছে। অপরের অনিচ্ছায় অপরের বুকের উপর এই প্রকার জাতীয় "হোম" কখনও সংশ্লিষ্ট জাতিকে আনন্দ ও শান্তি দিতে পারে না। য়িহুদীদের এই অভিজ্ঞতার পর কেহ যে জাতীয় 'হোমের' দাবী করিতে পারে ইহা কল্পনাও করা যাইতে পারে না। কিন্তু মুসলিম স্বার্থের রক্ষক মুসলিম লীগ আজ এই প্রকার "জাতীয় হোমের" একটা পরিকল্পনা রচনা করিয়া ভারতীয় মুসলমানের উদ্ধারের পথ বাৎলাইয়া দিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্য হইলে ভারতে যে দ্বিতীয় প্যালেষ্টাইনের পত্তন হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

য়িহুদীদের মত ভারতের মুসলমানগণ ভারতের চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। তাহাদেরকে একত্র করিয়া একটি আবাসভূমি দিতে হইবে। অন্যান্য অঞ্চল হইতে হিজরৎ করিয়া তাহারা এই "জাতীয় হোমে" আসিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিবে। তাহারা একাই সংগ্রাম করিয়া নিজেদের অঞ্চলকে স্বাধীন করিবে। গোটা ভারতের কথা ভাবিবার তাহাদের কোন দরকার নাই। বেশ ভাল কথা। কিন্তু এই সামান্য কথাটা লীগ-নেতারা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, এই পরিকল্পনা সফল হইলে ভারতের বুকে সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন যে আরও দৃঢ় হইয়া পড়িবে। য়িহুদীদের রক্ষার দায়িত্ব ঘাড়ে লইয়াছে বলিয়াই ত প্যালেষ্টানের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আজ চাপিয়া বসিয়া আছে। হিন্দু ভারতের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য তখন

মুসলিম "জাতীয়" হোমেরও যে তৃতীয় পক্ষের সাহায্যের দরকার হইবে। আবার অন্যদিকে মুসলমানদের হাত হইতে রক্ষার জন্য বাকী অংশের উপর সাম্রাজ্যবাদের দরদ আরও বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে চিরকাল ধরিয়া ভারত অপরের কবলিত হইয়া থাকিবে। ভারতকে পরাধীন রাখিবার ইচ্ছা যদি জিন্না সাহেব গোপন রাখিয়া সেই ইচ্ছা পুরণের জন্য কৌশলে "জাতীয় হোমের" পরিকল্পনা করিয়া থাকেন, তবে হয় ত কিছুদিন তাঁহার আশা সফল হইতে পারে। কিন্তু যদি তিনি আশা করেন, ইহার দ্বারা সত্যিকারের কোন কাজ হইবে, তাহা হইলে বলিব তিনি মায়ামৃগের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কারণ এ পরিকল্পনা কোনদিন রূপ গ্রহণ করিবে না। আর যদি করে, তবে মুসলিম জাতীয় 'হোম' কোনদিন স্বাধীনতা ভোগ করিবে না।

কেবল কি ভারতীয় মুসলমানগণই অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত একই দেশে একই সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে? অন্যান্য দেশের মুসলমানের জন্য কি একটা নির্দ্দিষ্ট অঞ্চল আছে? আজ সমগ্র মুসলিম জগতের মানচিত্রখানি মুসলমানকে খুলিয়া দেখিতে বলি। তাহাতে দেখা যাইবে, কোনও দেশে কেবলমাত্র মুসলমান নাই। নিকট-প্রাচ্যের দেশগুলিকে মুসলিম-প্রধান দেশ বলা হয়। কিন্তু সেই সব দেশের মুসলমানের সংখ্যা মাত্র ছয় কোটি। সমগ্র পৃথিবীতে চল্লিশ কোটি মুসলমান বাস করে। ছয় কোটিকে বাদ দিলে বাকী চৌত্রিশ কোটি মুসলমান এমন সব দেশে বাস করে, যেখানে মুসলিম রাষ্ট্র নাই, ইসলামী শরীয়ৎ বা ধর্ম্ম-ব্যবস্থা অনুসারে সে সব দেশ শাসিত হয় না। বিভিন্ন দেশের এই চৌত্রিশ কোটি মুসলমান অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত একই শাসনতন্ত্রে একই জাতি হইয়া একই নাগরিক অধিকার পাইয়া

বাস করিতেছে। কতিপয় ভারতীয় মুসলমান ব্যতীত ইহারা কোনও দিন জাতীয় "হোমের" দাবী করে নাই। ভারতে কি এমন ঘটিয়াছে যে, লীগ-পন্থিগণ জাতীয় ভূমির দাবী করিতেছেন? আমরা কি ব্যাঘ্র ভল্লুকবেষ্টিত বনজঙ্গলে বাস করিতেছি যে, আমাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা চাই। ভারতের চারিটি প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ! ইহাদের জন্য জাতীয় আবাসের কি প্রয়োজন? ভারত স্বাধীন হইলে তাহার পরিপূর্ণ সুবিধা এই চারি প্রদেশের মুসলমানগণই বেশী পাইবে। যদি এই চারিটি প্রদেশকে জাতীয় "হোম" করা হয়, তবে তাহাতেই বা কি সুবিধা হইবে? কারণ চারিটি প্রদেশ ত এক জায়গায় নাই? ইহাদের মধ্যে বাঙলা দেশ অপর তিনটি হইতে এত দূরে অবস্থিত যে ইহাকে তাহাদের সহিত এক করা যাইবে না। তবে কি বাঙালার অর্দ্ধেকের বেশী অধিবাসী পাঁচ ছয় শত বৎসরের স্মৃতি ভুলিয়া গিয়া দূর পাঞ্জাবে আশ্রয় লইতে যাইবে? বাকী সাতটি প্রদেশের মুসলমান-গণই বা কোন সুবিধার মোহে নিজেদের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া অন্য প্রদেশে নূতন করিয়া সংসার পত্তন করিতে যাইবে? তাহাও না হয় করিল। কিন্তু ইহাদের ভাষা ত এক নয়। নূতন জাতীয় "হোমে" গিয়া ভাষার সমস্যা লইয়া এমন গোলমাল আরম্ভ হইবে যে, তাহাতে মুসলিম সংহতির সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। তাছাড়া যাহারা নিজ দেশ ছাড়িয়া জাতীয় "হোমে" আশ্রয় লইবে, তাহারা "হোমের" আদি মুসলমানদের সহিত কখনই একাঙ্গী হইতে পারিবে না। এই "হোমের" আদি মুসলমানগণ সকল বিষয়ে প্রাধান্য দাবী করিবে। আর আগত মুসলমানগণ সমতার দাবী করিবে। এক সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া আরও সহস্রবিধ সমস্যা

আসিয়া দেখা দিবে। যে সব দেশে মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ, সেই সব দেশে অ-মুসলমানদের সহিত বহুদিন একত্র থাকার কারণে তাহারা এমন একটা অর্থনৈতিক দায়িত্বে আবদ্ধ আছে যে, হঠাৎ সে দায়িত্ব পরিহার করা চলিবে না। ইহাতে বহুদিন কাটিবে। ফলে ভারতের স্বাধীনতার সমস্যা অনন্ত-কালের জন্য স্থগিত রহিবে। সুতরাং জাতীয় "হোমের" দাবী মুসলমানের জন্য কোন কল্যাণের বাণী বহিয়া আনিবে না।

জিন্না সাহেবের উর্ব্বর মস্তিষ্ক যে অবশেষে এমন একটা উদ্ভট দাবী রচনা করিবে, তাহা আমরা কল্পনাও করি নাই। প্যালেসটাইনে জাতীয় "হোম" পাইয়া য়িহুদীগণ চিরকালের তরে স্বদেশের আরবদের সহানুভূতি হারাইয়াছে। ভারতে জিন্না সাহেব এই দাবী উত্থাপন করিয়া অনর্থক অ-মুসলমানদের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিতেছেন। কারণ এই দাবী পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলে ভারতের হিন্দুগণের মনে মুসলমানের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জাগিবে না; অনর্থক তাহাদের অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা কুড়াইয়া কি লাভ হইবে? য়িহুদীদের মতই আমাদের দুর্দ্দশা হইবে। গৃহে, বাহিরে সর্ব্বত্র আমরা নিন্দিত ও ধিক্কৃত হইব। ভারতে দ্বিতীয় প্যালেসটাইনের পরিকল্পনা করিয়া জিন্না সাহেব মুসলমানকে ধ্বংসের পথে আগাইয়া দিলেন। ইহার পরিণাম আমাদের জন্য বিষময় হইবে। হয় ত আমরা য়িহুদীদের মত চিরকাল ধরিয়া গৃহহারা যাযাবর জাতিতে পরিণত হইব। বিধাতা যেন আমাদেরকে এই দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা করেন।

মুসলিম লীগের স্বদেশ-প্রেম

মুসলিম লীগের ধুরন্ধর নেতারা প্রায় দাবী করিয়া থাকেন যে, দেশের অপরাপর সম্প্রদায় অপেক্ষা তাঁহাদের ভারত-প্রীতি একটুমাত্র কম নহে। তাঁহারাই বরং ভারতবর্ষকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন এবং ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তাঁহারাই অধিকতর আগ্রহান্বিত। কারণ তাঁহাদের বিবেচনায় লীগপন্থী মুসলমান ব্যতীত অন্য কেহই ভারতের জন্য সত্যিকারের স্বাধীনতা চাহেন না। ভারতের হিতের জন্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাঁহারা এতাবৎ কি কি মহৎ ব্রত পালন করিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাঁহাদের দাবীর যৌক্তিকতা কতদূর প্রবল তাহা উপলব্ধি হইবে। কংগ্রেসের পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসের পশ্চাতে আছে, ত্যাগ, আত্ম-বলিদান, সংগ্রাম ও সংঘর্ষের ব্যথাময় স্মৃতি। চারিদিকে শত্রু, মানুষের স্বাধীনভাবে কথা বলিবার অধিকার নাই, দেশ-শোষণের কোনরূপ সীমারেখা নাই, আপনার দাবীর কথা বুক ফুলাইয়া বলিবার সাহস কাহার নাই,—এই সঙ্গীন অবস্থার মধ্যে কংগ্রেস সংগ্রাম করিয়া দেশের দুর্দ্দশার কতকটা লাঘব করিয়াছে, দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, দেশবাসীর মুখে ভাষা ফুটাইয়াছে। কংগ্রেস যখন এইভাবে দেশেরই সেবায় নিযুক্ত, ঠিক সেই সময় সাম্রাজ্যবাদী সরকার তাহার কণ্ঠ রোধ করিবার জন্য তাঁহাদের সমস্ত শক্তি সমরাঙ্গনে আনয়ন করিলেন। এই শক্তি ব্যতীত দেশের এক বিরাট অঙ্গকে কংগ্রেস-দমনে নিয়োজিত করিলেন। এ দেশের যে সব

প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিনষ্ট করিতে ব্রিটিশ সরকারকে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মডারেট দল ও মুসলিম লীগ দলের নাম সকলের আগে উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস ঘোষণা করিল স্বাধীনতার জন্য সাক্ষাৎভাবে সংগ্রাম করিতে হইবে,—মডারেটগণ বলিলেন, উহা বিপ্লবের পথ, ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়া ধাপে ধাপে সংস্কার লইতে হইবে। আবার কংগ্রেস যখন প্রস্তাব করিল দেশের সর্ব্বসম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও সহযোগিতার ভিত্তিতে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তখন মুসলিম লীগ ইসলামের দোহাই দিয়া ঘোষণা করিল, ঐ প্রকার জাতীয়তা মুসলিম স্বার্থের বিরোধী। এই ভাবে একদিকে মডারেট ও অন্যদিকে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের প্রত্যেক আদর্শকে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। অথচ এই লীগই আজ দাবী করিতেছে যে, তাহার ভারত-প্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

গালভরা কথায় ভারত-প্রীতি ও স্বাধীনতার নাম উচ্চারণ করিলেই কাজ হয় না; ইহার জন্য কতকগুলি আদর্শকে স্বীকার করিতে হয় এবং তদনুসারে কাজ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ভারতের অখণ্ডতা স্বীকার করে না, বরং খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দেশের সংহতিকে বিনষ্ট করিতে চায়, তাহার মুখে ভারত-প্রীতি কথাটা একটা পরিহাস মাত্র। আর যে ব্যক্তি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকারীদের শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিতে সহায়তা করে, এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের শক্তি বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখে, তাহার স্বাধীনতার দাবী প্রকাণ্ড ভণ্ডামি। আজ কুড়ি বৎসরের অধিক হইতে মুসলিম লীগ নানাভাবে ভারতের সংহতিকে চূর্ণ করিতে সহায়তা করিতেছে

এবং বিবিধ প্রকার ছল করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যাহত করিয়া আসিতেছে। এই লীগ যখন ভারত প্রীতি ও স্বাধীনতার দাবী করে, তখন মুখ টিপিয়া হাস্য করা ব্যতীত অন্য কিছু করা সম্ভব হয় না।

সম্প্রতি মুসলিম লীগ তাহার ভারত প্রীতির এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে। আমরা এতাবৎ জানিতাম যাহারা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া থাকিবার পরামর্শ দেয়, তাহারাই কোন যৌথ পরিবারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার প্রধান উপাদান। কিন্তু অধুনা লীগ নেতারা বলিতেছেন যে, যাহারা পরিবারের সংহতিশক্তি নষ্ট করিয়া দেয়, ভাইকে ভাই হইতে পৃথক করিয়া দেয়, তাহারাই বিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃগণের পরম বন্ধু। মুসলিম শাসনের প্রাক্কাল হইতে ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভারতের সামাজিক ইতিহাস, হিন্দু-মুসলমানের সংহতির ইতিহাস। নানা ঘটনা আসিয়া এই সংহতির কাজে বাধা উৎপাদন করিয়াছে সত্য, কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত সাত শত বৎসর ধরিয়া ভারতে সংহতি ও সমন্বয়ের কাজ চলিয়া আসিয়াছে। ব্রিটিশ শাসনের পর হইতেও সজ্ঞানে ও বিবেচনা-সহকারে এই সমন্বয়ের পথে ভারত পাড়ি দিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক আদর্শের যোগাযোগে দেশবাসীর মনে এমন একটা ভাবধারা জাগিয়াছে, যাহার জন্য বিদেশী শাসকের ভেদনীতির প্রভাব পরিহার করিয়াও ভারতবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। কংগ্রেসের বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস এই সমন্বয় সাধনের ইতিহাস। কিন্তু অধুনা মুসলিম লীগ জাতির অর্দ্ধ শতাব্দীর সাধনাকে পণ্ড করিয়া দিয়া ভারতকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে মুসলিম স্বার্থের নামে অনেক কিছু করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা যে এইরূপ পরিণতি লাভ করিবে তাহা অনেকেই কল্পনা করিতে পারে নাই। কিছুদিন হইল হায়দ্রাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ আব্দুল লতিফ সাহেব "The Cultural Future of India" নামক পুস্তিকায় ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার একটা পরিকল্পনা করিয়াছেন। মুসলিম লীগ এই পরিকল্পনাকে মোটামুটিভাবে গ্রহণ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে দু-একটা সাধারণ কথা পাঠকবর্গের নিকট পেশ করিতে চাই।

উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী ডাক্তার লতিফ সাহেব সমগ্র ভারতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে চান :—মুসলিম সংস্কৃতির অঞ্চল ও হিন্দু সংস্কৃতির অঞ্চল। তাঁহার মতে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা এতদূর গভীর ও মূলগত পার্থক্যের উপর এত বেশী নির্ভর করে যে, একই দেশে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশিভাবে বাস করিতে পারিবে না। তাহারা পরস্পর ঝগড়া মারামারি করিবে, সুতরাং ভারতের কল্যাণের জন্য এবং হিন্দু-মুসলমানের কল্যাণের জন্য দেশকে এমনভাবে ভাগ করিতে হইবে যেন হিন্দু ও মুসলমান চিরকাল পৃথক হইয়া থাকিবার সুযোগ পায়। এক সঙ্গে থাকিলেই ত ঝগড়া করিবে, সুতরাং পৃথক হইয়া থাকিলে আর ঝগড়া করিবে না। অর্থাৎ গৃহপালিত পশুদের মধ্যে অত্যধিক মারামারি হইতে থাকিলে গৃহস্বামী যখন মধ্যে মধ্যে বাধ্য হইয়া পশুগুলিকে পৃথক করিয়া বাঁধিয়া রাখেন, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানকে সেইভাবে আইনরূপ রজ্জু দ্বারা পৃথক পৃথক দেশে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। লতিফ সাহেব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পার্থক্যই খুব বড় করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু আরও গভীরতর প্রদেশে ফল্গুধারার মত যে ঐক্য স্রোত

যুগ যুগ হইতে বহিতেছে, তাহা দেখিবার মত ও উপলব্ধি করিবার মত দূরদৃষ্টি তাঁহার নাই। কিন্তু পাঠকবর্গকে আমরা বলিয়া রাখিতেছি, এই পরিকল্পনা নিতান্ত অযৌক্তিক, হাস্যকর ও চপল মনের অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। কোন সুদূর অতীতে এরূপ পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ ধরিবে না। কিন্তু এই পরিকল্পনা লইয়া এদেশে আন্দোলন হইতে থাকিলে পরিকল্পনার পক্ষে লাভ-জনক কিছুই হইবে না; তবে এই ক্ষতি হইবে যে, উহাতে আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন অনেকটা ব্যাহত হইবে।

উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত দ্বিখণ্ডিত হইলে ভারতের কি ক্ষতি হইতে পারে, তাহাই আলোচনা করিব। হিন্দু-মুসলমানের বর্ত্তমান পার্থক্যটা হয় ত সুদূর ভবিষ্যতে নানা ঘটনার চাপে অথবা লোকলোচনের অগোচরে বিলীন হইয়া যাইত। কিন্তু দ্বিখণ্ডিত হইলে পরস্পরের মধ্যে মেলামেশার অবসর খুবই কম হইবে, সুতরাং তাহাদের পার্থক্য ত বিলীন হইবে না, বরং আরও গভীর হইয়া যাইবে। আজকাল যেমন প্রাদেশিকতা নগ্নমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে, দ্বিখণ্ডিত ভারতেও সেই ধরণের নানারূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনা আসিয়া ভারতকে বিদেশী শক্তির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য করিবে। মুসলিম নেতারা আশা করিতেছেন যে, সীমান্ত অঞ্চলের ও আরও পশ্চিম অঞ্চলের মুসলমানগণ মুসলিম ভারতের সহিত সহযোগিতা করিবে; ইরাক্, ইরাণ প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমানগণ তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবে। কিন্তু তাঁহাদের এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হইবে। আফগানিস্থান, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমান শক্তিগণ হয়ত তখন ভারতীয় মুসলমানকে নিজেদের দাস রূপে পরিণত করিবে। ইরাক্, ইরাণ প্রভৃতি

অঞ্চলের মুসলমানের মধ্যে স্বদেশিকতা আজকাল এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাহারা মুসলিম ভারত জয় করিলে মুসলমানকে স্বাধীনতা দিবে না, বরং পদানত করিয়া রাখিবে। তারপর ভারত খণ্ডিত হইলে যাহারা ভারতের হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ শত্রু, তাহাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং ভারত কোনও দিনই স্বাধীন হইবে না। ইউরোপীয় শক্তির শ্যেন দৃষ্টি হইতে ভারতের যে কোন অঞ্চলকে রক্ষা করিতে হইলে, এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবে। বরং এই পরিকল্পনা অনুসারে ভারত দ্বিখণ্ডিত হইলে সঙ্গে সঙ্গেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া ইউরোপের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে। মিষ্টার জিন্নাকে যাঁহারা দূরদর্শী বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করিয়াও কি তিনি তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন নেতা বলিয়া বিবেচিত হইবেন? বস্তুতঃ লতিফ সাহেবের এই পরিকল্পনা দুরভিসন্ধিপূর্ণ ও অবাস্তব। ইহা ভারতের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই করিবে,—এবং মুসলমানকে চিরদাস জাতিতে পরিণত করিবে। খোদা আমাদিগকে ইহা হইতে রক্ষা করুন।

পাকিস্থানের অর্থনৈতিক অসুবিধা

পাকিস্থানের প্রস্তাব যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার অন্তর্নিহিত অসুবিধার কথাগুলি একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াই মনে করিয়াছেন যে, কথার চটকে এবং আবেগপূর্ণ আবেদন দ্বারাই সকলকে পাকিস্থানের সমর্থক করিয়া তুলিবেন। তারপর যখন ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় আসিবে, তখন যেনতেন প্রকারে একটা কিছু করিয়া বসিবেন। ভাগ-বাঁটোয়ারার নীতিটা একবার গৃহীত হইলেই তাঁহাদের প্রস্তাবের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে, মুসলিম লীগের মানসম্ভ্রমও বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু ভারত বণ্টন সোজা ব্যাপার নহে। ইহার সমুদয় অতীত ইতিহাসকে অস্বীকার করিতে হইবে। ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। তবুও কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না। আমাদের মনে হয় অর্থনৈতিক সমস্যাটাই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গীন হইয়া উঠিবে। কারণ ইহার সহিত দেশের কোটি কোটি লোকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধকে অস্বীকার করিয়া মুসলিম লীগ পাকিস্থানের প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহা সমাজকে প্রতারিত করিবে, কিন্তু সমাজের মঙ্গল করিতে পারিবে না। এদেশের রাজনীতি কতকটা দাবা খেলার মত হইয়া পড়িয়াছে। যে যত ধাপ্পা দিয়া জনসমাজের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে, সে ততই লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করিবে। একথা সত্য যে, ব্রিটিশ-শক্তি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এদেশের এক বিরাট অংশের উপর মুসলমান রাজা রাজত্ব করিতেন।

সুতরাং আবার আমরা সেরূপে রাজত্ব করিব, এই যুক্তি একেবারে প্রথম শ্রেণীর ধাপ্পা। কিন্তু পাকিস্থান প্রস্তাব গ্রহণ করার পর হইতেই অনেকের মনে ক্ষীণ আশা জাগিয়াছে যে, তাঁহারা আবার তাঁহাদের প্রনষ্ট ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবেন। বিগত কয়েক যুগ হইতে পৃথিবীর ইতিহাসে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে—কত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নবযুগের পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত অবস্থার মধ্যে আবার নবাবী আমলকে ফিরাইয়া আনা অথবা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব ত বটেই, তাহা আবঞ্ছনীয়ও। পাকিস্থানের সমর্থকগণের অনেকেই ইহা বুঝেন। তাই এখনও তাঁহারা সেই মায়ামরীচিকার পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আমাদের মনে হয়, যাঁহারা পাকিস্থান পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য অন্যবিধ। তাঁহারা ভাল করিয়াই জানেন যে, পাকিস্থান কখনই বাস্তব রূপ গ্রহণ করিবে না। কিন্তু জনমতের মনস্তত্ত্ব তাঁহারা জানেন। তাই লোকপ্রিয়তা ও সস্তায় নেতৃত্ব লাভ করিবার জন্য তাঁহারা জনসাধারণ মুসলমানের ভ্রান্ত মানসিকতার সুবিধা লইয়া যথাতথা পাকিস্থানের মহিমা গাহিয়া বেড়ান। কিন্তু পাকিস্থানের অর্থনৈতিক অসুবিধার কথা চিন্তা করিলে কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি ইহা সমর্থন করিবেন না। বরং সমস্ত শক্তি দিয়া ইহার বিরোধিতা করিবেন।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কল্পনা তাঁহাদের বিকৃত মানসিকতা হইতে জাগিয়াছে। ইহা মুসলিম জনমতের উপর এক অপূর্ব্ব ও অনন্তসম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া

দিয়াছে। প্রাচীন মুসলমানের সমস্ত গৌরব পাকিস্থানে রূপ গ্রহণ করিবে। কিন্তু ইহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকটা কেহই ভাবিয়া দেখেন নাই। পরিকল্পিত পাকিস্থানে মুসলিম রাষ্ট্র না হয় হইল। কিন্তু সেখানকার কোটি কোটি অমুসলমানের কি হইবে? এ যুগে যখন মানুষের অধিকারের কথা লোকের মনে জাগিয়াছে; জনসাধারণের প্রভুত্ব, সমান অধিকার, আইনের শাসন, তুল্যবিচার প্রভৃতি বিষয়ের দাবীতে যে যুগের আকাশ ভূবন কাঁপিয়া উঠিতেছে, সে যুগে কি আবার মধ্যযুগীয় ধর্ম্মতন্ত্র ফিরিয়া আসিবে? পাকিস্থানের অমুসলমানগণ কি মুসলমানের প্রজা হিসাবে, দাসানুদাস হিসাবে বাস করিবে, না তাহারা মুসলমানের সহিত সমান অধিকারে অধিকারী হইবে? সেইরূপ হিন্দু রাজ্যের মুসলমান প্রজারা রাজনৈতিক অধিকার কি ভাবে পাইবে? এসব সমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করিবার বিষয়। এত গেল রাজনৈতিক সমস্যা। ইহার অর্থ নৈতিক দিকটা আরও গুরুতর ও অসমাধ্য। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বণ্টন করিলে এমন সব অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইবে, যাহা রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়া সত্ত্বেও দেশের অর্থসঙ্কট দূর করিতে পারিবে না। ধরিয়া লইলাম যে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে অর্থাৎ পাঞ্জাব অঞ্চলে ও বাঙ্গালা অঞ্চলে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হইয়া গেল। ভারতের অবশিষ্ট অঞ্চলে স্বতঃসিদ্ধভাবেই হিন্দুপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। হিন্দুরা ত পাকিস্থানের বিরোধিতা করিতেছে। সুতরাং তাহাদের অসুবিধার কথা আলোচনার বাহিরে। এখন দেখা যাক, পাকিস্থানে মুসলমানগণ আর্থিক দিক দিয়া কোন সুবিধা পাইতে পারে কি না।

পাকিস্থান লাভ করিবার জন্য যে ধরণের আন্দোলন হউক না কেন, ইহা সত্য যে, ভাগবাঁটোয়ারার শেষ মীমাংসার পূর্ব্বে বিভিন্ন দলের সহিত বহু আলোচনা হইবে। বহু বিষয়ের অনুসন্ধান লইতে হইবে, বহু আপোষ-সালিশ, কথা-কাটাকাটি হইবে। যেমন ব্রহ্মদেশ ব্যবচ্ছেদের সময় হইয়াছিল, সেইরূপ হইবে। লাভ-খতিয়ান, হিসাব-নিকাশ, অদল-বদল প্রভৃতি বিষয়ে নানা গবেষণা করিতে হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ ভারতের অন্তর্গত একটি প্রদেশ ছিল। কিন্তু আজ তাহা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিচ্ছেদের পূর্ব্বে উভয় দেশের মধ্যে বহু আলোচনা হইয়াছে, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি ব্যাপারে বহু গবেষণার পর ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অংশকে মূলকেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার সময় এই ধরণের বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। ব্রহ্মদেশ তাহার অস্তিত্বের জন্য ভারতের উপর নির্ভর করিত না। তাই বিচ্ছেদের পর তাহার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু ভারতকে কতকগুলি বিষয়ে ব্রহ্মদেশের উপর নির্ভর করিতে হইত। আজ ব্যবচ্ছেদের পর তাহা আমরা উপলব্ধি করিতেছি। ভারতের বিভিন্ন অংশ মূলকেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে বহু প্রদেশের অশেষবিধ অসুবিধা হইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া যদি স্বাধীন হইয়া বাঁচিতে চায় এবং স্বাধীনভাবে কাজ করিতে চায়, তাহা হইলেও এই খণ্ডিত অংশগুলিতে জীবনীশক্তির জন্য মূল দেহের উপর নির্ভর করিতে হইবে। নতুবা সেগুলি অচিরে শুষ্ক হইয়া যাইবে।

যদি ভারতের প্রদেশগুলি স্বতন্ত্র 'ইউনিট' হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আয় ও ব্যয়ের বিভাগটা সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। উত্তর-পশ্চিম

অর্থাৎ পাঞ্জাব ও সীমান্ত অঞ্চল এবং উত্তর-পূর্ব্ব অর্থাৎ বাঙ্গলা অঞ্চল—এই দুইটি দেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের সাধারণ কোন পন্থা নাই। ইহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হইবে। এই দুইটি দেশকে একই ফেডারেশনের অধীনে আনয়ন করা মোটেই সম্ভব হইবে না। সুতরাং এই দুইটি মুসলিম রাষ্ট্রে একই ধরণের আর্থিক পলিসি বা নীতি হইতে পারে না। ভারতের 'পাবলিক ঋণ', 'হোমচার্জ্জ'. রেলওয়ে, পোষ্টাল ও টেলিগ্রাফ বিভাগের লাভ-লোকসান, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের সিকিউরিটি—এই সব জটিল বিষয় বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার সময় মহা সমস্যার উদ্ভব হইবে। সেই সব সমস্যার জটিলতার সম্মুখে গোটা পাকিস্থান পরিকল্পনা দুর্ভেদ্য গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে পতিত হইবে। তাহা হইতে ইহা কোনদিনই উদ্ধার পাইবে না। জলসেচনের জন্য পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে 'পাবলিক ঋণ' একটা বিরাট অংশ চাপিয়া আছে। সমর ঘাঁটি নির্ম্মাণ ও সামরিক রেলওয়েজের বাবদ সীমান্ত সরকারকে বৎসরে বহু ঋণের বোঝা বহন করিতে হয়। সিন্ধুদেশ ত একটা ঘাটতি প্রদেশ। ইহার উপর এত ঋণের বোঝা চাপান আছে যে, অপরের সাহায্য ব্যতীত সে এক দণ্ডও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। অবশ্য বাঙ্গলা দেশের 'পাবলিক ঋণ' খুব বেশী নহে, অথবা বাঙ্গলা ঘাটতি প্রদেশও নহে। কিন্তু ইহার আয় ব্যয়েরই অনুরূপ। নিজের ব্যয়ভার বহন করিয়া বাঙ্গলা অপরের অভাব পূরণ করিতে পারিবে না। সিন্ধু প্রদেশ নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে না। আর পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ নিজের ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ। তাহারা অপরের বোঝা বহিতে পারিবে না। এই সকলকে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করিলেও চিরকাল

অর্থ কষ্টের মধ্যে থাকিতে হইবে। আজ সর্ব্বভারতীয় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট আছে বলিয়া এইগুলি কোনওরূপে টিকিয়া আছে। কিন্তু মূলকেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইলে ইহাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষার কোন উপায় থাকিবে না। অভাব, দারিদ্র্য ও দীনতার মধ্যে এই দেশগুলিকে সব সময় অপরের উপর নির্ভর করিতে হইবে। সীমান্ত-রক্ষার কোন ব্যবস্থাই থাকিবে না। এই অসুবিধা কি পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্রগুলির নজরে পড়িবে না? তখন ইহাদের স্বাধীন সত্তা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। তারপর পাকিস্থান রাষ্ট্র ও হিন্দু রাষ্ট্র এই দুয়ের যে সব 'পাবলিক ঋণ' আছে, সেগুলিরও ত একটা বণ্টন হইবে। তখন পাকিস্থান রাষ্ট্রের ঋণের ভার আরও বৃদ্ধি পাইবে। এক দেশ হইতে অন্য দেশে গিয়াছে, এমন সব রেলওয়ে লাইন বণ্টন ও 'পাবলিক ঋণ' বণ্টন—এই দুইটি বিষয় সহজ ব্যাপার নহে। গালভরা ভাষায় পাকিস্থানের পরিকল্পনা করিলে এগুলির কোন সমাধান হইবে না। যেখানে হিন্দু রাষ্ট্রে আয়ের পথ বিস্তীর্ণ হইয়া রহিবে, সেখানে পাকিস্থান রাষ্ট্রে আয়ের পথ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। অথচ ব্যয়ের ভাগ খুব বেশী হইবে। জাতীয় প্রয়োজনে ও গঠনমূলক কার্য্যে পাকিস্থান রাষ্ট্র আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। জাতিকে বাঁচাইতে হইলে ও জাতির স্বাধীন সত্তা রক্ষা করিতে হইলে চাই প্রচুর রুটি ও মাখন। আর চাই সমরোপযোগী নানা সরঞ্জাম। পাঞ্জাব সীমান্ত অঞ্চলে এবং বাঙ্গলা অঞ্চলে লোহার খনি নাই, অথবা লোহার কারখানা নাই। বড় বড় কয়লার খনি, অভ্র ও অন্যান্য ধাতুর খনি মুসলিম রাষ্ট্রের ভাগে পড়িবে না। জামসেদপুরের বিরাট লোহার কারখানা হিন্দু রাষ্ট্রের মধ্যে পড়িবে। কয়েকটি হিন্দু দেশীয় রাষ্ট্রে লোহা ও ইস্পাতের

কারখানা আছে। মহীশূরের বৈদ্যুতিক 'পাওয়ার হাউস', লোহা ও ইস্পাতের কারখানা হইতে হিন্দু রাষ্ট্র সুবিধা পাইবে। স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সবই হিন্দু রাষ্ট্রে পাওয়া যাইবে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলি সে সব হইতে বঞ্চিত হইয়া পরনির্ভরশীল হইয়া রহিবে।

খাদ্য, কাঁচামাল এবং খোরাকের জন্য নির্দ্দিষ্ট মূলধনের দিকটা আলোচনা করা যাক। খাদ্যসম্ভারে পাঞ্জাব ও বাঙ্গলা সমৃদ্ধশালী সন্দেহ নাই। পূর্ব্ববঙ্গ পাটের জন্য বিখ্যাত, ইহা বাঙ্গলার একটা নিজস্ব সম্পদ। কিন্তু পাটের ব্যবসায়ে সর্ব্বদাই বাহিরের বাজারের উপর বেশী পরিমাণ নির্ভর করিতে হয়। সেই জন্য পাটের অধিকাংশ লাভ বাঙ্গলার বাহিরের লোক পাইয়া থাকে। ইহা সত্য যে, বাঙ্গলায় প্রচুর চাউল হয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে বাঙ্গলার উৎপন্ন ফসল বাঙ্গলার অভাব মিটাইতে পারে না। বাঙ্গালার জন্য বিদেশের প্রচুর চাউল দরকার হয়। নতুবা সারা বাঙ্গলায় হাহাকার পড়িয়া যাইবে। অধুনা রেঙ্গুণের চাউলের আমদানি বন্ধ হইয়াছে; আর সঙ্গে সঙ্গে চাউলের মহার্ঘ্যতা দেখা দিয়াছে। ধাতব তৈল উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার দ্বারা ভাল কাজ হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব মোটামুটিভাবে সম্পদশালী হইলেও এই দুইটি দেশ সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। ভাগ-বাঁটোয়ারা হইয়া গেলে এই অসুবিধাগুলি সহজেই ধরা পড়িবে। তখন দেশ দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িবে। স্বাধীন রাষ্ট্র পাইতে গিয়া মুসলমান এমন একটা রাষ্ট্র পাইবে, যেখানে দারিদ্র্য তাহার চিরসঙ্গী হইবে।

যদি একবার শিল্প উৎপাদনের দিকে আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখা

যাইবে যে, পাঞ্জাব ও বাঙ্গলা অন্যান্য হিন্দু প্রধান প্রদেশ হইতে বেশী সুবিধা পাইবে না। কারণ শিল্পপ্রধান দেশ বাঙ্গলাও নয়, পাঞ্জাবও নয়। আর ভাগ-বাঁটোয়ারার পর হঠাৎ নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গজাইয়া উঠিবে না। সে জন্য যে অর্থ, শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতার দরকার, তাহা অর্জ্জন করিতে বহু সময় লাগিবে। আর এই দুইটি প্রদেশের সরকার নূতন রাষ্ট্রের ঘাটতি মিটাইতে এত ব্যতিব্যস্ত থাকিবেন যে, শিল্পের দিকে মনোযোগ দিবার অবসর পাইবেন না। বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবে কিছু কিছু তুলার চাষ হয়। কিন্তু কাঁচা তুলাকে পাকা মাল করিবার জন্য যে কলকারখানা দরকার, তাহা এই দুইটি প্রদেশ অপেক্ষা অ-মুসলমান রাষ্ট্রেই বেশী আছে। বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের তুলার সুবিধা হিন্দু রাষ্ট্রই পাইবে। বোম্বায়ে কাপড়ের কল অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বহুগুণ বেশী আছে। সম্প্রতি বাঙ্গলায় কাপড়ের কল কিছু হইয়াছে ; কিন্তু অপর প্রদেশের তুলনায় তাহা নগণ্য। বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব কাপড়ের জন্য অন্যান্য দেশের উপরই বেশী নির্ভর করে। চিনি শিল্প, লৌহ শিল্প, খনিজ ধাতু—এসব বিষয়েও এ দুইটি প্রদেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বর্ত্তমানে চিনির অধিকাংশ কল যুক্ত-প্রদেশে ও বিহারে প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য প্রদেশের কল উহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পারিয়া উঠিবে না। নানা কারণে বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব চিনির কারবারে উন্নতি করিতে পারিবে না। এইভাবে অন্যান্য শিল্পের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে অর্থনৈতিক ব্যাপারে মুসলিম-প্রধান প্রদেশগুলি অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। রাজনৈতিকভাবে প্রদেশ গঠন হয় ত অসম্ভব নাও হইতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক হইতে এরূপ ভাগবণ্টন কেন্দ্রচ্যুত প্রদেশ

দুইটির জন্য সর্ব্বনাশকর হইবে। আজ ঝোঁকের মাথায় লীগওয়ালারা যাহা চাহিতেছেন, বিষয়ের গুরুত্বের সহিত সাক্ষাত পরিচয় হইলে তাঁহারা সে জন্য পস্তাইবেন। সমস্ত বিষয় নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ভারত ব্যবচ্ছেদ হইলে পাকিস্থান ও কেন্দ্রীয় মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে অহরহ অর্থ নৈতিক সঙ্কট দেখা দিবে। পাকিস্থান এমন সব নূতন নূতন সমস্যার জন্ম দিবে, যাহা ব্রহ্মদেশের জটিলতা অপেক্ষা ঢের বেশী মারাত্মক হইবে। আজ সিন্ধু প্রদেশ ও উড়িষ্যা প্রদেশকে বহু অর্থ নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। মাথার উপর একটি সাধারণ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট আছে বলিয়া এই দরিদ্র প্রদেশ দুইটি কোনওক্রমে টিকিয়া আছে। কিন্তু কেন্দ্রচ্যুত হইলে পাকিস্থানের আমলে সিন্ধু প্রদেশের অবস্থা তদপেক্ষাও মারাত্মক হইবে। কারণ তখন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মাথার উপর যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃত্ব করিবে, তাহাকে প্রত্যেক প্রদেশের ঘাটতি মিটাইতে হইবে এবং এইভাবে সে নিজের ভার বহন করিতে অসমর্থ হইবে। তখন সিন্ধুর মত দেশকে উহা মোটেই সাহায্য করিতে পারিবে না। পাকিস্থানকে বাস্তব রূপ দিতে গেলে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অর্থাৎ সীমান্তের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। সামরিক খরচের সমস্ত অংশই এই প্রদেশের জন্য লাগিবে। এক্ষণে সীমান্তের সমস্ত ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেন। তাহার পরিমাণ কোটি কোটি টাকা। পাকিস্থান গঠিত হইলে হিন্দু ভারতের দেয় যে অংশ আজ কেন্দ্রীয় সরকার পাইতেছে, মুসলিম ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সরকার তাহার এক কপর্দ্দকও পাইবে না। এই ঘাটতি পাঞ্জাব ও বাঙ্গলা পূরণ করিতে পারিবে না। ইসলামের দোহাই

দিয়াও এই বিপুল অর্থ জোগাড় করা সম্ভবপর হইবে না। অর্থাভাবে পাকিস্থানের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত হইয়া রহিবে। দরিদ্র মুসলমান পাকিস্থানে হয় ত ইসলামের শাসন পাইবে, কিন্তু উদরের অন্ন সংস্থান করিতে পারিবে না। ইহাই যদি পাকিস্থানের পরিণতি হয়, তবে কোনও বুদ্ধিমান ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তি এক মুহূর্ত্তের তরে পাকিস্থানের দাবী সমর্থন করিবে না। পাকিস্থান মুসলমানদের জন্য 'গোরস্থান' রচনা করিবে।

পাকিস্থানের বিভিন্ন পরিকল্পনা বা স্কীম

মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করিবার কামনা হইতে পাকিস্থান পরিকল্পনা করা হইয়াছে। কি উপায়ে এই স্বার্থ রক্ষা হইতে পারে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন কোন পরিকল্পনা বিদ্যমান ছিল না, তখন ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক প্রভাবিত হইয়া সে যুগের মুসলমান নেতাগণ পৃথক নির্ব্বাচনকে মুসলমানের প্রধান রক্ষা-কবচ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহারা তখন আশা করিয়াছিলেন যে, পৃথক নির্ব্বাচন মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে যথেষ্ট হইবে! কিন্তু পৃথক নির্ব্বাচনে অমুসলমানদের আপত্তি ছিল। সেই জন্য কতকগুলি বুদ্ধিমান মুসলিম নেতা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, পৃথক নির্ব্বাচন অস্থায়ী ব্যবস্থা মাত্র। উপযুক্ত সময় হইলেই উহা রহিত করিয়া যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু সে সময় কখনও আসিল না। বরং পৃথক নির্ব্বাচনের উপরেও মুসলিম নেতারা আর এক ধাপ অগ্রসর হইলেন। যে সব প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু, সেখানে পৃথক নির্ব্বাচনসহ 'ওয়েটেজ' আদায় করিলেন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌএ কংগ্রেস-লীগ প্যাক্ট বা চুক্তি এই দাবী স্বীকার করিল। অতঃপর এই চুক্তির ভিত্তিতে প্রাদেশিক আইন সভাতে সাম্প্রদায়িক হার প্রবর্ত্তিত হইল। মনে হইল ইহাতেই বুঝি মুসলিম স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রহিবে। মুসলমান ব্যতীত ভারতে আরও বহু মাইনররিটি সম্প্রদায় আছে। তাহাদেরকেও এই ধরণের বিশেষ রক্ষা-কবচ দিতে হইল।

পাঞ্জাব ও বাঙ্গলাতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানকে 'ওয়েটেজ' দিবার সময় তাহাদিগকে বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের আইন সভা হইতে কিছু আসন ছাড়িয়া দিতে হইল। সুতরাং তাঁহারা দেখিলেন যে, লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট অনুসারে এই দুই প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যালঘু হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহারা তখন যুক্তি দিলেন, তাহা হউক, তাঁহাদেরই জাত-ভাইকে ত কিছু আসন ছাড়িয়া দিলেন অন্য প্রদেশে। কিন্তু পরে তাঁহারা দেখিলেন যে, সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানকে 'ওয়েটেজ' দেওয়াতে তাঁহাদের বিশেষ লাভ হয় নাই। কারণ 'ওয়েটেজ' পাইয়াও তাঁহারা সংখ্যা লঘু হইয়া রহিলেন। অথচ বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের আইন সভায় তাঁহারা মাইনরিটিতে পরিণত হইলেন। তখন তাঁহারা এই ব্যবস্থা রদ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; এবং ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে মিঃ জিন্না চৌদ্দ দফা রচনা করিয়া উহার উপর জোর দিতে লাগিলেন; এবং এতদ্দ্বারা লক্ষ্ণৌ প্যাক্টকে অচল করিয়া দিলেন। পরে ব্রিটিশ সরকার চৌদ্দ দফার অধিকাংশ দাবী মানিয়া লইল; এবং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাতে তাহা বিধিবদ্ধ করিল। অতঃপর এই বাঁটোয়ারা অনুসারে যখন প্রাদেশিক আইন সভাগুলি গঠিত হইল, তখন মুসলিম নেতাদের কি আনন্দ! কেহ কেহ বাঁটোয়ারাকে মুসলিম স্বার্থ ও অধিকারের 'ম্যাগনাকার্টা' বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যে সব প্রদেশে মুসলমানগণগণ মাইনরিটি, সেখানে তাঁহারা 'ওয়েটেজ' সহ পৃথক নির্ব্বাচন প্রাপ্ত হইলেন। এবং বাঙ্গলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশে তাঁহারা পৃথক নির্ব্বাচনসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেন। সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশে তাঁহারা

অনন্য নির্ভর হইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেন। পাঞ্জাবে তাঁহারা সামান্য মাত্র মেজরিটি হইলেন। বাঙ্গলাতে পূর্ণ মেজরিটি না হইলেও অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা তাঁহাদের আসন বেশী হইল। এই দুই প্রদেশে হিন্দুদের আসন কমাইয়া দেওয়া হইল। তাহারা মাইনরিটি হইয়াও কোন 'ওয়েটেজ' প্রাপ্ত হইল না। কিন্তু অন্যান্য মাইনরিটিদেরকে 'ওয়েটেজ' দেওয়া হইল—যথা ইউরোপীয় দল, এংলো-ইণ্ডিয়ান দল ইত্যাদি। সুতরাং বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের হিন্দুগণ 'ওয়েটেজ' ত পাইল না, তাহারা তাহাদের সংখ্যানুরূপ আসনও পাইল না। কারণ তাহাদের আসন কমাইয়া অপরকে দেওয়া হইল। সেই জন্য হিন্দুরা অসন্তুষ্ট হইয়া বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিল। অবস্থা তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, মুসলমানগণ আসন বণ্টনের দিক দিয়া উপযুক্ত রক্ষা-কবচ (safeguard) পাইয়াছেন। মাইনরিটি প্রদেশে তাঁহারা 'ওয়েটেজ' পাইয়াছেন, এবং পৃথক নির্ব্বাচনও পাইয়াছেন এবং নির্ব্বাচনের জন্য তাঁহাদেরকে অন্য কাহারও উপর নির্ভর করিতে হইবে না। আর মেজরিটি প্রদেশে তাঁহারাই অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক আসন পাইয়াছেন। একক পার্টি হিসাবে তাঁহারাই গরিষ্ঠদল। কিন্তু এসব সুবিধা পাইয়াও তাঁহাদের অভিযোগের কারণ দূর হইল না। তাই তাঁহারা তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এক সময় যাহাকে রক্ষা-কবচ বলিয়া মনে করা হইয়াছিল, কিছুদিন পরে দেখা গেল যে, তাহা রক্ষা-কবচই নহে। পরে তাঁহাদেরই দাবী মত 'বাঁটোয়ারা' (Communal Award) রূপ রক্ষা-কবচ দেওয়া হইল। কিন্তু ইহাও তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট রক্ষা-কবচ বলিয়া বিবেচিত হইল না। তাই এখন পাকিস্তানের দাবী তুলিয়াছেন। তাঁহাদের দাবীর পশ্চাতে

কোন মহৎ আদর্শ নাই বলিয়া প্রথম যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা অনির্দ্দিষ্টভাবে মায়া মৃগের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আমাদের ভয় হয়, তাঁহাদিগকে চিরদিনই এই ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে!

অবস্থা যে এইরূপ হইবে তাহা জাতীয়তাবাদী বহু মুসলমান নেতা অনেক পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্য চিন্তাশীল ও বহু দূরদর্শী কতকগুলি মুসলমান নেতা গোড়া হইতেই পৃথক নির্ব্বাচন চাহেন নাই, 'ওয়েটেজও' চাহেন নাই। তাঁহারা অবাধ মিশ্র নির্ব্বাচনেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তবে সাময়িকভাবে আসন সংরক্ষণসহ মিশ্র নির্ব্বাচনে তাঁহাদের কোন আপত্তি ছিল না। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, 'ওয়েটেজ' ও পৃথক নির্ব্বাচন সত্যিকারের রক্ষা-কবচ নহে। এইগুলি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বাড়াইয়া তুলিবে এবং মুসলমানের সত্যিকারের উপকার করিবে না। কিন্তু লীগ পন্থী মুসলমান নেতাগণ তখন তাঁহাদের সাবধান বাণী গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহারা দেশের সাধারণ কল্যাণের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া পৃথক নির্ব্বাচন ও 'ওয়েটেজের' উপর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আর তাঁহাদের দাবী মত মুসলমানকে এই দুইটিই দেওয়া হইয়াছে। আজ কয়েক বৎসর হইতে মুসলমানগণ এই দুইটি সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। এইগুলিই যদি প্রকৃত রক্ষা-কবচ হয়, তবে কেন মুসলমানের উপর অত্যাচার হইতেছে বলিয়া অভিযোগ উঠে? জোর গলায় বলা হইয়া থাকে যে, কংগ্রেসী প্রদেশে, অর্থাৎ হিন্দু মেজরিটি প্রদেশে মুসলমানের উপর হিন্দুরা ভীষণ অত্যাচার করিতেছে, তাহাদের সভ্যতা, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বিনষ্ট করা হইতেছে। যদি এই সব অভিযোগ সত্য হয়, তবে ইহার জন্য লীগ নেতারাই দায়ী।

তাঁহাদেরই প্রার্থনামত তাঁহাদেরকে সকল রকম রক্ষা-কবচ দেওয়া হইয়াছে। রক্ষা-কবচ প্রার্থনা করিবার সময় কেন তাঁহারা এসব কথা চিন্তা করেন নাই? দীর্ঘ দিনের পরে তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, এত আন্দোলন করিয়া তাঁহারা যে সব রক্ষা-কবচ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। কংগ্রেসী প্রদেশে মুসলমানের উপর বাস্তবিকই কোন অত্যাচার হইয়াছে কি না সে আলোচনা এখানে করিব না। কিন্তু তর্ক স্থলে যদি এই অত্যাচারের কথা স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, রক্ষা-কবচগুলিকে আজ তাঁহারা মুসলিম স্বার্থ রক্ষার জন্য উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছেন না। অতঃপর তাঁহাদের কি করা উচিত ছিল? বুকে সাহস লইয়া দ্বিধাহীন চিত্তে এই সব রক্ষা-কবচ উঠাইয়া দিয়া অবাধ মিশ্র নির্ব্বাচনের জন্যই আন্দোলন করাই ছিল শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু তাঁহারা সে দিকে গেলেন না। তাঁহারা ধরিলেন একেবারেই উলটা পথ। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, তবে ভারতবর্ষকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাগ করিয়া দাও; এমনভাবে ভাগ করিয়া দাও যেন মুসলমান ও হিন্দু আলাদা হইয়া স্বতন্ত্র স্বরাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। এই দাবীর সঙ্গে সঙ্গে ভারত বণ্টনের নানা স্কীম বা পরিকল্পনা রচিত হইতে লাগিল। আমরা একে একে সেগুলি আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষের দুই অঞ্চলে মুসলমানের ঘন বসতি; এবং অন্যান্য অঞ্চলে তাহাদের বসতি কম এবং বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমান ঘনভাবে বাস করে। বাঙ্গলার পূর্ব্বাঞ্চলেও সেইরূপ। কিন্তু এই দুই অঞ্চলেও হিন্দুদের সংখ্যা যে একেবারেই নাই তাহা নহে। তাই দুই

অঞ্চলকে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মুসলিম-রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিলেও মাইনরিটি সমস্যার চির সমাধান হইবে না। কারণ এ সকল অঞ্চলে যে সব মাইনরিটি থাকিবে তাহারা মুসলিম শাসন মানিয়া লইবে না। কোন রক্ষা-কবচই তাহাদেরকে নিরাপত্তাবোধ দিতে পারিবে না, যেমন দিতে পারে নাই মুসলমানদেরকে। সুতরাং এই সব প্রদেশের মাইনরিটি সমস্যা পূর্ব্বের মতই গণ্ডগোল সৃষ্টি করিতে থাকিবে। পার্থক্য এই হইবে যে, এই প্রদেশে মাইনরিটি রহিবে অমুসলমানগণ, আর মেজরিটি রহিবে মুসলমানগণ। মেজরিটি সম্প্রদায় মাইনরিটিকে ধ্বংস করিবে—যদি এই অভিযোগ ঠিক হয়, তাহা হইলে এই সব অঞ্চলের মাইনরিটি সমস্যা কঠিন ও শোচনীয় হইয়াই রহিবে।

এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কেহ কেহ বলিতেছেন যে, অধিবাসী বিনিময় করিলেই সব গোলমাল মিটিয়া যাইবে। মুসলিম-প্রধান অঞ্চলের হিন্দু ও অন্যান্য মাইনরিটিকে অপসারিত করিয়া নিকটবর্ত্তী হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে পাঠাইয়া দিতে হইবে। সেইরূপ হিন্দু-প্রধান অঞ্চল হইতে মুসলমানকে সরাইয়া আনিয়া নিকটস্থ মুসলিম-প্রধান অঞ্চলে রাখিতে হইবে। এই অপসরণ কার্য্য এমন নিপুণভাবে করিতে হইবে যেন হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে কেবল হিন্দু থাকে, এবং মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে কেবল মুসলমান থাকে। যদি ইহা সম্ভব হয়, তবে প্রশ্ন হইতেছে বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, যুক্ত প্রদেশের মুসলমানকে সরাইয়া কোথায় রাখা যাইবে? তাহাদের সংরক্ষণেরই বা কি ব্যবস্থা করা যাইবে? সামান্য একটা প্রস্তাবের বলে এক দেশের লোককে তাড়াইয়া অন্য দেশে লইয়া যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। হিন্দু-

প্রধান অঞ্চলের মুসলমানগণ বহু যুগের স্বার্থ, ভাষা, সংস্কৃতি, আবাসভূমি প্রভৃতি ছাড়িয়া কেমন করিয়া একটা নূতন দেশে বিভিন্ন আবহাওয়া, বিভিন্ন পরিস্থিতি, বিভিন্ন ভাষা ও স্বার্থের মধ্যে আশ্রয় লইয়া নিজেদেরকে খাপ খাওয়াই চলিবে? ভূমির প্রতি প্রত্যেক মানুষের একটা প্রাণের আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণ ছাড়িয়া কোন্ সুবিধার লোভে মানুষ অন্যত্র যাইতে সম্মত হইবে? অপসারণের সময় নানাবিধ খরচা, ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের ব্যয়, নূতন ভাবে জীবন-ধারণের জন্য মূলধন, এসব কোথা হইতে ও কেমন ভাবে পাওয়া যাইবে? একসঙ্গে এত লোকের অপসারণে আরও আনুসঙ্গিক অসুবিধা আছে। এইসব কারণে অধিবাসী বিনিময়ের কথা কল্পনা করা যায় না। পাকিস্থানের নানা পরিকল্পনা বা স্কীমের মধ্যে দুইটি স্কীমে ব্যাপকভাবে অধিবাসী বিনিময় সম্বন্ধে বেশী উচ্চবাচ্য নাই। কারণ স্কীম-রচকগণ জানেন যে, অধিবাসী বিনিময় কোন মতেই সম্ভব হইবে না। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে, অধিবাসী বিনিময় যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে Homogeneous বা একজাতিসম্পন্ন মুসলিম রাষ্ট্র ও অমুসলমান রাষ্ট্র কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? দু'একটা মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্র সৃষ্টি হইলেই কি তাহা সম্ভব হইবে? আর যদি তাই হয়, তবুও ত বহু মুসলমানকে অমুসলমান-রাষ্ট্রে থাকিতে বাধ্য হইতে হইবে। সেখানে হিন্দু প্রাধান্যের প্রভাবে মুসলমানের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, সভ্যতা ইত্যাদি কি বিপদাপন্ন ও খর্ব্ব হইবে না? মেজরিটিগণ সর্ব্বদাই মাইনরিটি মুসলমানকে ধ্বংস করিবে, অত্যাচার করিবে, এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে হিন্দু-প্রধান অঞ্চলের মুসলিম মাইনরিটিদের রক্ষার কি ব্যবস্থা

লীগওয়ালারা দিতে পারেন? একথা বলা যাইতে পারে যে, মুসলিম-প্রধান অঞ্চলে অমুসলমান মাইনরিটিগণ প্রতিভূর (Hostage) মত বাস করিবে। ঠিক সেইরূপ হিন্দু-প্রধান অঞ্চলের মুসলমানগণও প্রতিভূর হিসাবে বাস করিবে। এই কারণে মুসলমান হিন্দুর প্রতি, এবং হিন্দু মুসলমানের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে। তাহার অন্যথা হইলে হিন্দু মাইনরিটি ও মুসলিম মাইনরিটি নানাভাবে উত্যক্ত ও অত্যাচারিত হইবে।

কিন্তু একটু প্রণিধান করিলে বুঝা যাইবে যে, এই যুক্তি একেবারেই অসার। এক প্রদেশের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য অন্য প্রদেশের মুসলমান হিন্দুর প্রতি, অথবা হিন্দু মুসলমানের প্রতি কোনও অবিচার করিবে না। রামের অপরাধে শ্যামকে, অথবা কাসেমের অপরাধে হাশেমকে কেহ শাস্তি দিতে যাইবে না। বাঙ্গলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশ—এই কয়েকটি প্রদেশ মুসলিম-প্রধান অঞ্চল। মুসলিম লীগের একটা প্রধান অভিযোগ এই যে, কংগ্রেস হিন্দু-প্রধান অঞ্চলের মুসলমানের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত চারিটি প্রদেশের মুসলমান-গণ স্ব স্ব প্রদেশের হিন্দুদের উপর সে অত্যাচারের প্রতিশোধ লয় নাই। সুতরাং 'হোষ্টেজ থিওরী' (hostage theory) একেবারে বাজে বিষয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মাইনরিটি রক্ষার সমস্ত 'থিওরী' একটা ভ্রান্ত মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি গাড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। একমাত্র রক্ষা-কবচ যাহার কিছু মূল্য আছে, যাহার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে এবং যাহা প্রয়োজনের সময় কার্য্যকরী হইতে পারে,—তাহা হইতেছে সদ্ভাব, মিতালি ও ভালবাসা। এই গুলির দ্বারা যে রক্ষা-কবচ পাওয়া যাইবে তাহাই ঠিক

যথার্থ ও স্থায়ী। এই অমূল্য ভূষণ হইতে কোন মানুষ বঞ্চিত নহে। যে নৈতিক আদর্শ প্রত্যেক ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, যে মহত্তর প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত হইয়া আছে, তাহাই মাইনরিটিকে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবে। পাকিস্থানের কোন স্কীম বা পরিকল্পনা সে রক্ষা-কবচ কল্পনাও করিতে পারে না।

পাকিস্থান কথাটা শুনিতে যতই চমকপ্রদ হউক না কেন, কেহই এ সম্পর্কে কোন সর্ব্ববাদীসম্মত পরিকল্পনা দিতে পারেন নাই। এসম্বন্ধে পাঁচটি স্কীম বা পরিকল্পনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; যথা :—(১) "পাঞ্জাবী" এই ছদ্ম নামে জনৈক লেখক একখানি পুস্তকে তাঁহার একটি নিজস্ব স্কীমের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। ইহার নাম কনফিডারেসি স্কীম। (২) আলিগড় কলেজের দুইজন অধ্যাপক একটা স্কীম রচনা করিয়াছেন ; তাহা আলিগড় স্কীম বলিয়া পরিচিত। (৩) হায়দ্রাবাদের ডাঃ আবদুল লতিফ একটি স্কীমের রচয়িতা। তাহার নাম লতিফের স্কীম। (৪) পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী সার সেকান্দার হায়াৎ খাঁর একটি স্কীম আছে, তাহা সেকান্দার স্কীম নামে অভিহিত। (৫) সর্ব্বশেষে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবে ভারতবণ্টনের একটা স্কীমের আভাষ দেওয়া হইয়াছে। আমরা এইবার একে একে এই স্কীমগুলি আলোচনা করিব।

১। কনফিডারেসি স্কীম

(১) ইহার মতে বর্ত্তমানের বিশাল ভারতকে দেশ বলিলে মহা ভূল হইবে। ইহা একটা মহাদেশ। এই মহাদেশকে নিম্নভাবে ভাগ করা

যাইতে পারে ; এবং বিভক্ত অংশগুলি পরস্পরের সহিত কনফিডারেসির ভিত্তিতে সংযুক্ত হইবে। যথা :—(১) সিন্ধু অঞ্চলে একটি ফেডারেশেন গঠিত হইবে। ইহাতে থাকিবে পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, বেলুচিস্থান, ভাওলপুর, আম্ব, দীরসোয়াত, চিত্রল, খানপুর, কালাত, লাসবেলা, কর্পূরতলা ও মালেরকোটালা। পাঞ্জাবের অন্তর্গত হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলি হইতে আম্বালা বিভাগ, কংগ্রা জেলা, হুশিয়ারপুর জেলার উনা ও গার সাংকার তহসিল বাদ যাইবে। লেখক এই অঞ্চলের নাম দিয়াছেন "**ইন্দোস্থান**"। ইহার পরিধি ৩৯৮৮৩৮ বর্গ মাইল, ও লোক সংখ্যা হইবে ৩৩০, ০০০। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৮২ জন মুসলমান, আটজন হিন্দু, ছয় জন শিখ এবং বক্রী অন্যান্য সম্প্রদায়। (২) হিন্দু ভারত-ফেডারেশন। ইহাতে থাকিবে, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, বাঙ্গলার কিয়দংশ, উড়িষ্যা, আসাম, মাদ্রাজ, বোম্বাই, এবং রাজস্থান ও দাক্ষিণাত্য ব্যতীত অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য। রাজস্থান ও দাক্ষিণাত্যের দেশীয় রাজ্যদ্বয়, ষ্টেট ফেডারেশনের মধ্যে থাকিবে। এই অঞ্চলের পরিধি ৭৪২১৭৩ বর্গ মাইল—লোক সংখ্যা ২১, ৬০৪১ ৫৪১—হিন্দু শতকরা ৮৩.৭২ জন। মুসলমান শতকরা ১১ জন।

(৩) রাজস্থান ফেডারেশন :—ইহাতে থাকিবে রাজস্থান ও মধ্য-ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য। পরিধি ১৮০৬৫৬, লোকসংখ্যা—১,৭৮,৫৮৫০২। হিন্দু শতকরা ৮৬.৩৯ জন। মুসলমান শতকরা ৮.০৯১ জন।

(৪) দাক্ষিণাত্য যুক্তরাষ্ট্র :—ইহাতে থাকিবে হায়দ্রাবাদ, মহীশূর

এবং বাস্তুর ষ্টেট। পরিধি —১২৫০৮৬; লোকসংখ্যা ২১৫১৮১৭১। হিন্দু শতকরা ৮৫.২৮ জন; মুসলমান শতকরা ৮.৯১ জন।

(৫) বাঙ্গলা যুক্তরাষ্ট্র—ইহাতে থাকিবে পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত মুসলিম-প্রধান অঞ্চল, আসামের গোয়ালপাড়া ও শ্রীহট্ট জেলা এবং ত্রিপুরা ও নিকটস্থ অন্যান্য দেশীয় রাজ্য। পরিধি—৫৯৭৬৪ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা—৩১০,০০,০০০। এখানে দুইকোটি পাঁচ লক্ষ মুসলমান অর্থাৎ শতকরা ৩৩.৯১ জন। লেখক পশ্চিম বঙ্গের কতিপয় জেলাকে হিন্দু-ভারত ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করিতে চান।

'পাঞ্জাবী' লেখকের মতে ইহাই হইবে ভারতের আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা। প্রত্যেক ফেডারেশন এই বৃহত্তর কনফিডারেশনে যোগদান করিলেও প্রত্যেকের জন্য একটি পূর্ণ ক্ষমতা সহ শাসন ব্যবস্থা থাকিবে। এবং এইভাবে পাঁচটি ফেডারেশন পাঁচ জন বড়লাটের অধীনে থাকিবে। প্রত্যেকটি ফেডারেশন আবার কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত হইবে। তাহাতে থাকিবেন একজন করিয়া ছোট লাট। কতকগুলি বিশেষ আইন, বিধিব্যবস্থার দ্বারা এই ফেডারেশনগুলি কনফিডারেশনের সহিত সংযুক্ত হইবে। তাঁহার মতে ভারতের মত মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে কৃষ্টি, সভ্যতা, ও ধর্ম্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারা একই কনফিডারেশনের অধীনে থাকিবে। সেই জন্য লেখক অধিবাসী বিনিময় সমর্থন করেন না। মুসলমান-প্রধান অঞ্চলের হিন্দুবহুল অংশকে কাছাকাছি কোন হিন্দু-প্রধান অংশের সহিত তিনি যোগ দিতে চান এবং সেইরূপ হিন্দু-প্রধান অঞ্চলের মুসলমান

বহুল অংশকে মুসলিম প্রধান অংশের সহিত যোগ দিতে চান। এই বিভাগের ফলে সিন্ধু অঞ্চলের প্রায় আড়াই কোটি মুসলমান, এবং বাঙ্গলা ও আসামের দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ মুসলমান হিন্দুদের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবে। এবং সেই সঙ্গে প্রায় তিন কোটি হিন্দু মুসলিম প্রভাব হইতে মুক্তি পাইবে। অতঃপর গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, উত্তর পশ্চিমের মুসলমান ও হিন্দু-ভারতের মুসলমানের মধ্যে জাতিগত (Racial) কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু তাহার চেয়ে কঠিন ব্যাপার, সাংস্কৃতিক ও ধর্ম্মীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সব অঞ্চলের মুসলমানগণ সাধারণতঃ হিন্দু হইতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এখন তাহারা হিন্দু হইতে সম্পূর্ণ আলাদা জাতি ও আলাদা বর্ণ হিসাবে আলাদা ভাবে বাস করিতে চায়। তাঁহার মতে এই ভাবে দেশকে বিভাগ করিলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবাদ ও রাজনৈতিক সংগ্রাম থামিয়া যাইবে; আজিকার মত সাম্প্রদায়িক কলহ আর হইবে না। খাঁটি মুসলিম প্রধান অঞ্চলে ধর্ম্মের উপর রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। ধর্ম্ম-প্রেম ও স্বদেশ-ভক্তি একই পথে গিয়া পবিত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করিবে। হিন্দুরাও নিজেদের রাষ্ট্রে এই ধরণের শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারিবে। ইহা তাহাদের সমস্যা; তাহারা যাহা ভাল বিবেচনা করে তাহাই করিবে।

সমালোচনা

কিন্তু একটু প্রণিধান করিলে এই স্কীমের অন্তর্নিহিত গলদগুলি সহজে ধরা পড়িবে। "পাঞ্জাবী ভদ্রলোক" কতকগুলি ভুল ধারণাকে খাঁটি সত্য বলিয়া

স্বীকার করিয়া স্কীম রচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা এই গুলি এবার আলোচনা করিব।

(১) তাঁহার প্রধান 'থিওরী' ভারতবর্ষ একটা দেশ নয়, ইহা একটি মহাদেশ। ইহাকেই আমরা মস্ত বড় ভুল বলিয়া মনে করি। প্রকৃতি এমন কতকগুলি সীমারেখা দিয়া ভারতকে এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ হইতে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে যে, ভারতবর্ষকে একটা অখণ্ড দেশ ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমের কিয়দংশে পর্ব্বত ও কিয়দংশে সমুদ্র এবং দক্ষিণে ও পূর্ব্বের কিয়দংশে পর্ব্বত ও সমতলভূমি, ইহারই সীমার মধ্যে যে প্রকাণ্ড দেশ তাহাই আমাদের ভারতবর্ষ। এই ভারত অখণ্ড, ইহাকে ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত সুবিধার জন্য নানা খণ্ডে বিভক্ত করিলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া হইবে। আজ গায়ের জোরে বিভক্ত করিয়া দিলেও ভবিষ্যতে স্বাভাবিক নিয়মে তাহা আবার একত্র ও সম্মিলিত হইয়া যাইবে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পার্শি, বৌদ্ধ—ইহারা আলাদা জাতি এই 'থিওরী'ও ভ্রান্ত ও কুযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের বিভিন্ন অধিবাসীগণ ধর্ম্মে পৃথক হইলেও, তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি সাধারণ সুদৃঢ় বন্ধন আছে যাহার জন্য তাহারা নিজেদেরকে একই জাতির অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতে বাধ্য। ইউরোপ ও আমেরিকায় যদি ভারতের দুইটি প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান গমন করে, তবে তাহারা এই সুদৃঢ় বন্ধন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হইবে। পরাধীনতা, আর্থিক দৈন্য, সমবেদনা বোধ, স্বাধীনতার সমপ্রয়োজন বোধ, বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রদেশে প্রদেশে একই প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহার, জনসাধারণের মধ্যে একই পোষাক ব্যবহার—এই ধরণের

মিলনের বহু সাধারণ গ্রন্থি পরিদৃষ্ট হইবে, যাহা নিশ্চিতরূপে বলিয়া দিবে যে, ভারতবাসী একটি অখণ্ড জাতির অন্তর্গত।

(২) উক্ত স্কীম দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে বহু মুসলমান থাকিবে, এবং মুসলিম-প্রধান অঞ্চলেও বহু হিন্দু থাকিবে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলকে বিভক্ত করিয়া দিলেও কোন দিনই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হইবে না।

(৩) কনফিডারেশনের মধ্যে যে সব ইউনিট-এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা কোন বোধগম্য ভিত্তিতে রচিত হয় নাই। ইউনিটগুলি হইবে স্বাধীন, অথচ কনফিডারেশনের অধীনে থাকিবে—ইহার কোন অর্থ হয় না। তাছাড়া উক্ত স্কীমে ব্রিটিশ-প্রভাবমুক্ত স্বাধীন ভারতের কথা চিন্তা করা হয় নাই।

(৪) হিন্দু ও মুসলমান ব্যতীত আরও বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে। কিন্তু তাহাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। শিখ, খৃষ্টান, পার্শিগণও ত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী করিতে পারে। দাবী না করিলেও তাহাদেরকেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সুবিধা দিতে হইবে। এই দাবী পূরণ করিতে গেলে আরও ধর্ম্ম-রাষ্ট্র সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহার সুবিধা বিদেশীগণই বেশী পাইবে।

(৫) ইহার মূল কথা ভারতে আবার মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপন করা। কিন্তু এ যুগে ইহা চলিতে পারে না। এ যুগে ধর্ম্মনিরপক্ষ রাষ্ট্রই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। হিন্দু-রাজ অথবা মুসলিম-রাজ কোনটাই ভারতের জন্য কল্যাণকর নয়। ভারতকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত করিলে ইহার কেন্দ্রীয় শক্তি এত দুর্ব্বল

হইয়া পড়িবে যে, যে কোন বিদেশীর আক্রমণে ভারতবর্ষ পরাধীন হইয়া যাইবে।

(৬) ভারতবর্ষ একটা দেশ নয়—ইহা বিবেচনা করা মহা ভুল। ইহা সত্য যে, ভারতের মধ্যে প্রদেশ প্রভেদে নানা প্রকার ভূমি, আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আছে। এই ধরণের পার্থক্য কম বেশী সকল মহা দেশের বৃহৎ বৃহৎ দেশে বিদ্যমান আছে। ভাগ-বণ্টন করিয়া যে সব অঞ্চলকে অন্য অঞ্চল হইতে আলাদা করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ভূমি (Soil), আবহাওয়া ও স্বাভাবিক দৃশ্যের বিভিন্নতা আছে। যেমন—উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের সিন্ধুনদের শস্যশ্যামল অংশ আরও পশ্চিমের পর্ব্বতময় অংশ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আবার উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের বাঙ্গলা ও আসাম অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। এই সব বিভিন্নতা সত্ত্বেও যদি উত্তর পশ্চিমকে, ও উত্তর পূর্ব্বকে এক একটি স্বতন্ত্র দেশে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে সমগ্র ভারতবর্ষকে কোন একই দেশের অন্তর্গত করিয়া রাখা হইবে না। তাহার কারণ তিনি দেখাইতে পারেন নাই। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, সেই আদিকাল হইতে সসাগরা ভারতবর্ষ একই দেশ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে এই ভারতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু প্রত্যেক প্রবল ও শক্তিশালী সম্রাটের বিশেষ লক্ষ্য ছিল—সমগ্র ভারতকে এক করা ও তাহার জন্য একই রাষ্ট্র গঠন করা। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, গুপ্তবংশের সম্রাটগণ, হর্ষবর্দ্ধন, পাঠানগণ, এবং মোগলগণ—সকলেই এক অখণ্ড ভারত ও অখণ্ড সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শেষে ব্রিটিশগণও তাহাই করিয়াছেন। তাঁহারা নূতন কিছু করেন নাই। অতীতে ভারতে বিভিন্ন রাষ্ট্র ছিল সত্য। কিন্তু ভারতের কোন অংশকেই কেহ আলাদা দেশ ভাবে নাই। শাসকদের শক্তি অনুসারে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ও অন্যান্য প্রদেশের সীমারেখার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু স্বয়ং প্রকৃতি দেবী ভারতের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা এক ও অখণ্ড দেশের। মুসলমান রাজা হইবে, কি হিন্দু রাজা হইবে প্রকৃতি তাহা চিন্তা করিয়া দেখে নাই।

(৭) হিন্দু-মুসলমান—এই দুইটি ধর্ম্ম সম্প্রদায় আলাদা Raceএর অন্তর্ভুক্ত —ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মত। "পাঞ্জাবী" গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন যে, Raceএর দিক হইতে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কারণ ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, ভারতের বহু মুসলমান হিন্দু বংশ হইতে উৎপন্ন। যে প্রদেশে ও যে অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান বাস করে, তাহারা সেইখানের ভাষা সমান ভাবে ব্যবহার করে। পাঞ্জাবের হিন্দু, মুসলমান ও শিখগণ পাঞ্জাবী ভাষা ব্যবহার করে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে তাহারা পুস্তু ভাষা ব্যবহার করে; সিন্ধুতে সিন্ধি ভাষা, বাঙ্গলাতে বাঙ্গলা ভাষা, আসামে আসামী ভাষা। এইভাবে প্রত্যেক প্রদেশে তত্রত্য ভাষা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ভাষা ও জাতির ভিত্তিতে হিন্দু মুসলমানকে বিভক্ত করা যাইতে পারে না। "পাঞ্জাবী ভদ্রলোক" কর্ত্তৃক পরিকল্পিত 'ইন্দোস্তান' অঞ্চলে পুস্তু, কাশ্মিরী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বেলুচিস্থানী ও আরও কয়েকটি খণ্ড ভাষা ব্যবহৃত হয়। এতগুলি ভাষাভাষীকে যদি একটি ফেডারেশনের অধীনে আনয়ন করা সম্ভব হয়, তবে সমগ্র ভারতকে একই রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করা কেন সম্ভব

হইবে না ? বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে বলিয়া ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিবার কোন কারণই থাকিতে পারে না।

(৮) ধর্ম্মের পার্থক্য—লীগওয়ালারা এইটার উপর অত্যন্ত জোর দিয়া থাকেন। এই পার্থক্যের কথা আমরাও অস্বীকার করি না। আমাদের মতে এই পার্থক্য ব্যতীত হিন্দু-মুসলমানে অন্য কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু ইহা জাতীয়তার পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। ধর্ম্মের পার্থক্যের কারণে হিন্দু-মুসলমানের কতকগুলি সামাজিক প্রথা ও ব্যক্তিগত আইনে কিছু কিছু পার্থক্য আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভারতের হিন্দু মুসলমান অতীতে এই সব পার্থক্যকে কখনও বড় করিয়া দেখে নাই। ইহাকে তাহাদের মিতালি স্থাপনের পথে বাধা স্বরূপ দাঁড়াইতে দেয় নাই। বরং ইহাকে ছোট করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে। এমন বহু সামাজিক ও পারিবারিক প্রথা আছে যাহা হিন্দু মুসলমান হইতে, আর মুসলমান হিন্দু হইতে গ্রহণ করিয়া আপনার করিয়া লইয়াছে। বহু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করিয়াও পূর্ব্বের বহু নির্দ্দোষ প্রথা বর্জ্জন করে নাই, বরং তাহা সযত্নে মুসলমান সমাজে চালাইয়া দিয়াছে। গোঁড়া মুসলমানগণ এই সব হিন্দু প্রথাকে বর্জ্জন করিবার জন্য আন্দোলন করে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহা কি এক জাতীয়তার পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইবে ? ধর্ম্মীয় পার্থক্য মুসলমানকে হিন্দু হইতে আলাদা জাতিতে পরিণত করিতে পারে নাই, আর কোনও দিনই পারিবে না। আফগানিস্থানের মুসলমানের মধ্যে যে সব প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা সিরিয়া, তুরস্ক, মিসর, প্যালেসটাইন প্রভৃতি দেশ হইতে পৃথক। সেগুলি কখনই এক নহে। তাহাদের জীবনধারাও এক নহে। বাঙ্গালী

মুসলমান, পাঞ্জাবী মুসলমান, সিন্ধি মুসলমান কি চীন, তুরস্ক ও আলবেনিয়ার মুসলমান হইতে প্রথা ও আচার বিষয়ে পৃথক নহে? পাঞ্জাবের হিন্দু অথবা সিন্ধু দেশের হিন্দুর সহিত আচার ও প্রথার বিষয়ে উক্ত প্রদেশের মুসলমানের এমন এক সামঞ্জস্য আছে যাহা চীন ও আরবের মুসলমানের সহিত নাই। ধর্ম্ম, বিশ্বাস ও উপাসনা-পদ্ধতি সব মুসলমানের এক হইলেও,—ভাষা, পোষাক, প্রথা, রীতিনীতি ও জীবন ধারার প্রণালীতে তাহারা ভারতের বাহিরের মুসলমান হইতে বহু পরিমাণে সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং সব মুসলমান এক, এই যুক্তিতে ও ধর্ম্মের ভিত্তিতে কোন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা চলিতে পারে না। ইসলামের একটা জীবন-দর্শন আছে—ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, মুসলমান বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া নানা পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন স্বীকার করিয়া লইয়াছে; খুঁটিনাটি বিষয়ে নানা বৈচিত্র্য অবলম্বন করিয়াছে। মুসলমান যে দেশেই গিয়াছে সেই দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে। শত পার্থক্য, বিভিন্নতা, বিপরীত পরিস্থিতির মধ্যেও ইসলামের মৌলিক সত্য ও নীতি বিকশিত হইয়াছে ও চিরকাল হইতে থাকিবে। নিজেদের সার সত্য বজায় রাখিয়া অপরের ভাল অংশ গ্রহণ করা ইসলামের একটা প্রধান নীতি। মুসলমানগণ ভারতে আসিয়া তাহাই করিয়াছে। কেন তবে মুসলমান ভারতীয় হইতে বিরত হইবে? কেন তবে ভারতের মাটির প্রতি তাহার ভালবাসা জন্মিবে না? এ দেশের সকল শ্রেণীর অধিবাসীর সহিত সে একই সূত্রে ও একই তারে বাঁধা আছে। তাহাদের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, সভ্যতা ইত্যাদিকে সংরক্ষণ করিবার দাবী

অন্যায় নহে, অযৌক্তিকও নহে। সেগুলির জন্য তাহারা যে সব ব্যবস্থা, যে সব রক্ষা-কবচ দরকারী মনে করে তাহা পাইবে, আর না পাইলে তাহার জন্য আন্দোলন ও সংগ্রাম করিবার অধিকার কেহই হরণ করিতে পারিবে না। এজন্য যে সব অধিকার ও সুবিধা দরকার তাহা বহু পরিমাণে মুসলমান পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহার অর্থ ইহাই নহে যে, মুসলমান ভারতবাসী নহে। তাহারা ভারতবাসী হইতে পৃথক কোন জীব নহে যে, তাহারা যে অঞ্চলে বাস করে সেই অঞ্চলকে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করিয়া দিতে হইবে এবং একটি স্বতন্ত্র দেশবাসী বলিয়া গণ্য হইবে; এবং তাহাদিগকে এমন একটা সূক্ষ্ম কন্‌ফিডারেসির সূত্রে বাঁধিয়া দিতে হইবে যাহা যে কোন মুহুর্ত্তে ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।

(৯) হিন্দু ভারত ও মুসলিম ভারত সৃষ্টি করিয়া ক্রমবর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্যই ভারত বণ্টনের স্কীম রচিত হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য স্কীম বা অন্য কোন স্কীম দ্বারাই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইবে না। ইহাই আমাদের সুচিন্তিত বিশ্বাস। উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, এই বিভাগ দ্বারা দেশের অবশিষ্ট সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। হিন্দু রাষ্ট্রে মুসলমান থাকিবে এবং মুসলমান রাষ্ট্রে হিন্দু থাকিবে। হিন্দু রাষ্ট্রের মুসলমানগণ এবং মুসলিম রাষ্ট্রের হিন্দুগণ আবার নানা সমস্যা উদ্ভাবন করিবে। হিন্দুরা মুসলমানকে নিপীড়ন করিতেছে, এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে পৃথক হইলেও সে অত্যাচারের কারণ নিবারিত হইবে না। যুক্ত-প্রদেশ ও বিহারের মুসলমানগণ সংখ্যায় খুব কম। ইহাদেরকে কি হিন্দুদের হাতে

ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? এই সব অঞ্চলের মুসলমানগণ বিদ্যা বুদ্ধি ও অন্যান্য যোগ্যতায় অপরাপর অঞ্চল হইতে কোন অংশে কম নহে, বরং কতক কতক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। দ্বিখণ্ডিত ভারতে ইহাদের অবস্থা কি হইবে? অখণ্ড ভারত হইতে পৃথক হইয়া গেলে মুসলমান এমনভাবে স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে, যাহা তাহাব কোন কল্যাণ আনয়ন করিবে না। এইভাবে ছাড়াছাড়ি হইয়া মুসলমানকে সাহায্য করিবার নামে বাহির হইতে মুসলিম শক্তি আসিয়া তাহাদের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইবে। শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশের স্বাধীনতাই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যে সব মুসলমান হিন্দু-ভারতে থাকিতে বাধ্য হইবে, তাহাদের সংখ্যা ত নগণ্য হইবে না,—বহু সংখ্যায় তাহারা হিন্দু-ভারতে বাস করিবে। আর সেই জন্য হিন্দু মুসলমান সমস্যা দিন দিন উৎকট আকার ধারণ করিবে। বর্ত্তমানে এই সব হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে মুসলমানের জন্য যে সব রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা আছে, ও পরে দরকার হইবে, তাহাই যদি দ্বিখণ্ডিত ভারতে থাকিয়া যায়, তবে ভারত বণ্টনের সার্থকতা কোথায় রহিল? স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হইলে এই সব হিন্দু-প্রধান দেশের উপর মুসলমানের কোন হাত রহিবে না। সুতরাং এখানে তাহাদের উপর অত্যাচার হইলে কোন প্রতিকার হইবে না। "পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের" সমগ্র স্কীমকে ভাল করিয়া পাঠ করিলে দেখা যাইবে, ইহার মধ্যে যুক্তি ও দূরদর্শিতার নাম গন্ধও নাই। সমগ্র স্কীমটি একটি বিরাট ধাপ্পাবাজী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

(১০) "পাঞ্জাবী ভদ্রলোক" যে অঞ্চলকে "ইন্দোস্তান" বলিয়াছেন এইবার সেই সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলিব। এই বিস্তৃত ভূমির বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মবোধ ব্যতীত ঐক্যের আর কোন বন্ধন নাই। এখানে

পাঁচটি ভাষা প্রচলিত আছে। অতীতে এই সমুদয় অঞ্চল কখনও এক হয় নাই। কখনও তাহাদের মধ্যে সংহতি গড়িয়া উঠে নাই। এমন কোন ঐক্য বোধ নাই যাহা এই অঞ্চলের বিভিন্ন অধিবাসীকে একই ফেডারেশনের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে। ইতিহাস বলে, ইহারা কখনই এক ছিল না, কখনও এক হয় নাই। শিখ, পাঠান, পাঞ্জাবী, বেলুচি, সিন্ধি এবং কাশ্মিরী —এইগুলিকে একই ফেডারেশনের অধীনে আনয়ন করিবার কল্পনা করা হইয়াছে। ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে তাহারা এক গবর্ণমেণ্টের অধীনে আসে নাই, তাহারা পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিয়াছে, ঝগড়া করিয়াছে—রক্তারক্তি করিয়াছে। সে স্মৃতি এখনও তাহাদের মধ্য হইতে মুছিয়া যায় নাই। ভারতের অন্য কোন দেশে বিভিন্ন অধিবাসীদের মধ্যে এত বিষদৃশ ভাব দেখা যায় না। যদি প্রস্তাবিত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের "ইন্দোস্তানের" শিখ ও মুসলমানগণ সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর শত্রুতা ও ঝগড়া বিবাদ ভুলিয়া একই ফেডারেশনে থাকিতে পারে, তাহা হইলে ইহা কি অসম্ভব ও অকল্পনীয় যে, হিন্দু ও মুসলমানগণ তাহাদের যুগযুগের শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া একই ভারতে একটি সংযুক্ত ফেডারেশনের অধীনে থাকিতে পারিবে না ? "ইন্দোস্তানে" যদি পারে, তবে অখণ্ড ভারতে কেন পারিবে না ? প্রস্তাবিত "ইন্দোস্তানে" হিন্দু ও শিখ মাইনরিটির সংখ্যা হইবে প্রায় শতকরা চৌদ্দজন। দুই ধর্ম্ম এক সঙ্গে একই দেশে থাকিতে পারিবে না, এই 'থিওরী' যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এখানেও সেই সমস্যা রহিয়া যাইবে। এখানেও ত একদল অপর দলকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিবে ! এ সম্বন্ধে লীগওয়ালাদের কোন উত্তর নাই।

(১১) উত্তর পশ্চিম ফেডারেশন অর্থাৎ "ইন্দোস্থানে" পরস্পরের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব যদি বিপদাপন্ন হয়, তাহা হইলে হিন্দু ফেডারেশনের অবস্থা ত আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। এখানে কমপক্ষে ছয়টি ফেডারেশন গঠিত হইবে। এই হিন্দু ফেডারেশনের সীমা ও পরিধি বহুদূর বিস্তৃত হইবে। হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত এবং উত্তর পূর্ব্ব ফেডারেশনের পশ্চিম সীমা হইতে আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই হিন্দু ফেডারেশন রচিত হইবে। কতকগুলি 'করিডার' সৃষ্টি করিয়া ইহার এক অংশকে অন্য অংশের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। ইহাদের স্বাভাবিক আবেষ্টন হইতে কতকগুলি অংশকে কাটিয়া দিতে হইবে এবং অন্য এমন এক অংশের সহিত যুক্ত করিতে হইবে যাহার সহিত তাহারা বহু যুগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পুস্তু, সিন্ধি ও বেলুচী ব্যতীত ভারত প্রচলিত সকল ভাষা ব্যবহৃত হয়—যথা, বাঙ্গলা, হিন্দী, উর্দ্দু, কয়থী, উড়িয়া, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি। কারণ এই অঞ্চলের মধ্যে প্রত্যেক ভাষা ভাষী দেশের কিছু কিছু অংশ থাকিবে। এখানে ভারত-প্রচলিত প্রত্যেক ধর্ম্মের লোক থাকিবে—তাহাদের সংখ্যা অবশ্য অন্য দেশ হইতে কিছু কম-বেশী। ব্রিটিশ ভারতের ও দেশীয় রাজ্যের অনেকগুলি অংশ ইহার মধ্যে আসিবে। এই বৃহৎ হিন্দু-রাষ্ট্রের মধ্যে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেডারেশন হইবে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন মিলনকেন্দ্র থাকিবে না। এই অঞ্চলে অন্যূন দুই কোটি মুসলমান থাকিবে। যদি এই সব অঞ্চলকে লইয়া একটি ফেডারেশন গঠিত হয় এবং তাহা কার্য্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র ভারতকে লইয়া কেন একটি ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র হইতে পারিবে

না? ইচ্ছামত-ভারত বণ্টনের দাবী করিলেই হইল আর কি? যুক্তি, সঙ্গতি, সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি দেখিবার কোনই দরকার নাই!

(১২) রাজপুতানা ও মধ্য-ভারত এজেন্সিকে লইয়া যদি একটি ফেডারেশন গঠিত হয়, তবে বাস্তরকে এই অঞ্চল হইতে পৃথক করিয়া হায়দ্রাবাদ ফেডারেশনের সহিত কেন যুক্ত করা হইবে তাহার কোন কারণ "পাঞ্জাবী" ভদ্রলোক দেখাইতে পারেন নাই। ভাষার দিক হইতে এই বাস্তর অঞ্চল উড়িষ্যা অথবা ছত্তিসগড়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। সেইরূপ তিনি কোন কারণ দেখাইতে পারন নাই—কেন ত্রিবাঙ্কুর ও কচিন রাজ্য দুইটিকে হিন্দু-ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে? নৈকট্যের দিক হইতে এই দুইটি অঞ্চল মহিশূরের নিকটবর্ত্তী। সুতরাং এগুলিকে দাক্ষিণাত্য ফেডারেশনের অন্তর্গত করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। তারপর হায়দ্রাবাদ ষ্টেটে তিনটি ভাষা চলে—মারাঠি, তেলেগু এবং কেনারি। তাছাড়া কিছু কিছু উর্দ্দু ভাষাও চলে। এখানে মুসলমানের সংখ্যা খুব কম। ভাষা সমস্যা ত আছে। তা ছাড়া সংস্কৃতি ও আচার বিচারের গণ্ডগোলও আছে। এত সব পার্থক্য থাকা সত্ত্বে এখানে যদি একটি ফেডারেশন চলে, তাহা হইলে সমগ্র ভারতে উহা কেন চলিবে না।

সুতরাং যেদিক দিয়াই বিবেচনা করিয়া দেখা যাক না কেন, জাতিত্বের দিক হইতে, ভাষার দিক হইতে, ইতিহাস, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির দিক হইতে—কোন প্রকারেই "পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের" প্রস্তাবিত কনফিডারেশন স্কীম যুক্তির নিক্তিতে দাঁড়াইতে পারিবে না। কারণ ইহার কোন বাস্তব ও স্থায়ী ভিত্তি নাই। এই ভাবে ভারত বণ্টন হিন্দু-মুসলমান সমস্যার আদৌ কোন সমাধান

করিবে না। ইহা সমগ্র দেশকে দুর্ব্বল করিয়া দিবে। অন্য সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করিতে মোটেই সম্মত হইবে না; তাহারা ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করিবে। গৃহবিবাদ ও সাম্প্রদায়িক কলহ আরও বাড়িয়া যাইবে। এই পথে দেশের উন্নতি নাই। একই ভিত্তিতে, একই ভ্রাতৃত্ব ও জাতিত্বের বন্ধনে সমগ্র ভারতবাসীকে আবদ্ধ করিয়া একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠন ব্যতীত অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত পন্থা নাই।

২। আলিগড় স্কীম

আলিগড়ের দুইজন অধ্যাপক—সৈয়দ জাফরুল হাসান ও মহম্মদ আফজাল হোসেন কাদেরী ভারত বণ্টনের একটা স্কীম রচনা করিয়াছেন। তাহাই "আলিগড় স্কীম" নামে পরিচিত। তাঁহাদের স্কীমের ভিত্তি হইতেছে:—
(১) ভারতের মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি। তাহাদের একটা স্বতন্ত্র জাতীয় স্বত্বা আছে, তাহা হিন্দু অথবা অন্য কোন অমুসলমান হইতে পৃথক। সুডেটান জার্ম্মান ও চেক জাতির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, হিন্দু ও মুসলমানের পার্থক্য তাহা অপেক্ষাও গুরুতর ও অসামাধ্য।

(২) ভারতের মুসলমানের একটা স্বতন্ত্র জাতীয় ভবিষ্যৎ আছে, পৃথিবীর কল্যাণের জন্য তাহাদের একটা স্বতন্ত্র বাণী ও আদর্শ আছে।

(৩) হিন্দু, ব্রিটিশ অথবা অন্য কোন জাতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকাতেই মুসলমানের ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও উন্নতি নিহিত আছে।

(৪) মুসলমান মেজরিটি প্রদেশগুলিকে কোন ক্রমেই নিখিল ভারতীয় ফেডারেশনের সহিত যুক্ত করিয়া তাহাদিগকে হিন্দুদের অধীনে রাখা যাইতে

পারিবে না। কারণ সেইরূপ অখণ্ড ভারতের কেন্দ্রে হিন্দুরাই বহুগুণে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবে। মুসলমান ইহা কখনও বরদাস্ত করিবে না।

(৫) মাইনরিটি প্রদেশের মুসলমানগণকে কোনক্রমেই তাহাদের ধর্ম্মীয়, কৃষ্টিগত ও রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা চলিবে না। সুতরাং মেজরিটি প্রদেশের মুসলমানগণ ইহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি দিবে।

(৬) হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে মুসলিম স্বার্থরক্ষার জন্য একটি মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকিবে। রাষ্ট্র ইহাকে মানিয়া লইবে।

এই আদর্শগুলি কার্য্যকরী করিবার জন্য নিম্নোক্তভাবে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিতে হইবে—এগুলি হইবে পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র :—

(১) পাকিস্থান—ইহাতে থাকিবে, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম, চাম্বা, সাকিত, সুমিন, কপূর্রতলা, মালেরকোটলা, চিত্রল, দীর, কালাত, লোহারু, বিলাসপুর সিমলা হিল ষ্টেটস, এবং বাহাওয়ালপুর।

লোকসংখ্যা—৩৯২,৭৪,২৪৪—মুসলিম—২,৩৬,৯৭,৫৩৮; অনুপাত শতকরা ৬০'৩ জন।

(২) বাঙ্গলা—(হাওড়া ও মেদিনীপুর বাদ) সমগ্র বাঙ্গলা, বিহারের পূর্ণিয়া জেলা এবং আসামের শ্রীহট্ট জেলা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। লোকসংখ্যা —৫,২৫,৭৯,২৩২—মুসলমান—৩,০১, ১৮,১৮৪; শতকরা—৫৭'০ জন।

(৩) হিন্দুস্থান—ভারতের বক্রী অংশ এবং অন্যান্য দেশীয় রাজ্য ইহার মধ্যে থাকিবে। তবে হায়দ্রাবাদ, বাঙ্গলা পাকিস্থান এবং ইহাদের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য—এই হিন্দুস্থান হইতে বাদ যাইবে।

লোকসংখ্যা—২১,৬০,০০,০০০—মুসলমান—২,০৯৬০,০০০ ; শতকরা ৯৭ জন।

(৪) হায়দ্রাবাদ—ইহার মধ্যে হায়দ্রাবাদ, বেরার এবং কর্ণাট থাকিবে।

লোকসংখ্যা—২৯০৬৭০২৮—মুসলিম ২১৪৪০১০ ;—শতকরা ৭.৪ জন।

(৫) দিল্লী প্রদেশ—ইহা গঠিত হইবে দিল্লী অঞ্চল, মিরাট বিভাগ, রোহিলখণ্ড বিভাগ এবং আলিগড় জেলা।

লোক সংখ্যা—১২৬,০০,০০০—মুসলিম—৩৫২০০০০ ; শতকরা—২৮ জন।

(৬) মালাবার প্রদেশ—ইহা মালাবার ও দক্ষিণ কাণাড়ার সংলগ্ন অঞ্চল লইয়া গঠিত হইবে।

লোকসংখ্যা—৪৯,০০,০০০ মুসলিম—১৪,৪০,০০০ ; শতকরা ২৭ জন।

(৭) ভারতের যে সমস্ত নগরের লোক সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার অথবা ততোধিক, সে গুলির প্রত্যেকটি এক 'ব'রো' (Borough) অথবা স্বাধীন নগরের অধিকার পাইবে। তাহাদিগকে বহু পরিমাণে 'অটোনমি' দিতে হইবে। এই সমস্ত নগরের মুসলিম সংখ্যা হইবে ১৩,৮৮৬৯৮।

(৮) হিন্দু ভারতের গ্রামাঞ্চলের মুসলমানগণ এখনকার মত বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারিবে না। তাহাদিগকে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া কাছাকাছি স্থানে একত্র থাকিতে বাধ্য করা হইবে। এমন ভাবে থাকিবে যেন তাহারা এক একটা গ্রামাঞ্চলে মুসলিম বসতি গঠন করিতে পারে।

পাকিস্থান, হিন্দুস্থান এবং বাঙ্গলা এই তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত নিম্নরূপ আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক বন্ধুত্ব দ্বারা আবদ্ধ থাকিবে।

(১) একে অপরের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইবে।

(২) পাকিস্তান ও বাঙ্গলাকে মুসলিম-আবাসভূমি বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। আর হিন্দুস্থান হিন্দুদের আবাসভূমি বলিয়া স্বীকৃত হইবে। ইচ্ছা করিলে হিন্দুস্থান হইতে মুসলমানকে, আর মুসলিম-প্রধান অঞ্চল হইতে হিন্দুকে 'মাইগ্রেট' (স্থান পরিবর্ত্তন) করিবার অধিকার দিতে হইবে।

(৩) হিন্দুস্থানে মুসলমানগণ মাইনরিটি জাতি বলিয়া গণ্য হইবে। তাহাদিগকে পাকিস্থান ও বাঙ্গলার মুসলিম জাতির সহিত একই জাতির পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

(৪) হিন্দুস্থানে মুসলিম মাইনরিটিগণ এবং পাকিস্থানে ও বাঙ্গলায় হিন্দু মাইনরিটিগণ এই সব সুবিধা পাইবে :—

(ক) আইনসভায় জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকার ;

(খ) প্রতিনিধিত্বের প্রত্যেক স্তরে পৃথক নির্ব্বাচন ;

(গ) প্রয়োজনমত অন্যান্য রক্ষা-কবচ। এই তিনটি রাষ্ট্র অন্যান্য মাইনরিটিকে পৃথক নির্ব্বাচন সহ সংখ্যানুপাতে আসন দিবে, যথা—শিখ, হরিজন হিন্দু ইত্যাদি।

(ঘ) একটা মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকিবে। ইহা হিন্দুস্থানের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করিবে।

এই তিনটি রাষ্ট্র যথা—হিন্দুস্থান, পাকিস্থান ও বাঙ্গলা, গ্রেট ব্রিটেনের সহিত স্বতন্ত্র সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকিবে। ইহাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করিয়া ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতিনিধি থাকিবেন। তিনি সম্রাটের নামে শাসন

করিবেন। রাষ্ট্রের পরস্পরের মধ্যে, অথবা কোন একটি বা অধিক রাষ্ট্রের সহিত সম্রাট প্রতিনিধির মধ্যে কোন বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে একটি সম্মিলিত সালিসি আদালতে তাহা বিচারার্থ প্রেরিত হইবে।

সমালোচনা

ইহাই হইল আলিগড়ের অধ্যাপকদ্বয়ের স্কীম। এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। না আছে ইহাতে কোন সঙ্গতি, আর না আছে কোন উচ্চতর আদর্শ। লেখকদের নিকট সমগ্র ভারতবর্ষ হাতের লাড্ডু বিশেষ। যখন যাহাকে ইচ্ছা বণ্টন করিয়া দিলেই চলিবে। অধ্যাপকদ্বয় যেন শিক্ষানবিশ চিকিৎসক। ভারত-মাতার দেহকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া, এক স্থানকে অন্য স্থানে রাখিয়া, অথবা কোন স্থানকে একেবারেই কাটিয়া বাদ দিয়া কাটাকাটির বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চান। এই ভাবে 'এক্সপেরিমেণ্ট' করিয়া তাঁহারা কোটি কোটি ভারতবাসীর ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছেন। কিন্তু এতসব বিষয়ের মধ্যেও তাঁহারা ব্রিটিশ-আশ্রয়ের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহারা ব্রিটিশের অধীনে এবং ব্রিটিশের নির্দ্দেশের অপেক্ষায় থাকিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত বাস করিতে চান। তাই সমগ্র স্কীমে স্বাধীনতার দাবী ত করাই হয় নাই, বরং তাঁহারা এমন সব ব্যবস্থার দাবী করিয়াছেন যাহার জন্য অনন্তকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে পরাধীন থাকিতে হইবে। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে এই খণ্ডিত ভারতকে রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা ইহাতে নাই। এই স্কীম বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ এমনভাবে জন্মাইয়া দিবে যে, বৈদেশিক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধেও তাহারা এক হইতে পারিবে না।

প্রবল বিদেশী শক্তি এক রাষ্ট্রকে হাত করিয়া অন্য রাষ্ট্রকে গ্রাস করিবে, এবং পরে সাহায্যকারী রাষ্ট্রকেও কুক্ষিগত করিবে। ইহা বন্ধ করিবার জন্য স্কীমে কোন ব্যবস্থা নাই। বরং উক্ত স্কীম কার্য্যে পরিণত হইলে অহরহ এই ধরণের আক্রমণ ভারতকে বিব্রত করিতে থাকিবে। একতাবদ্ধ ও সংহতি-সম্পন্ন ভারতবর্ষ ব্যতীত কোন ব্যবস্থাই ইহা রোধ করিতে পারিবে না।

"পঞ্জাবী ভদ্রলোকের" স্কীমের সমালোচনা করিবার সময় ভারতের একজাতিত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্বন্ধে (এবং পুস্তকের অন্যত্র) যে সব আলোচনা করিয়াছি, এখানেও সেইগুলি প্রযুক্ত হইবে। সেইজন্য এখানে আর স্বতন্ত্র আলোচনা করিলাম না। যে সব নূতন বিষয় এই স্কীমে দাবী করা হইয়াছে কেবল তাহারই আলোচনা করিব। অধ্যাপকদ্বয়ের স্কীম হায়দ্রাবাদকে একটি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু যেখানে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সেস্থানকে মুসলিম রাষ্ট্র করিবার কোন কারণই থাকিতে পারে না। কর্ণাটাকে হায়দ্রাবাদের সহিত যোগ করিবার কোন কারণ দেখান হয় নাই। হায়দ্রাবাদের মুসলিম সংখ্যা মাত্র শতকরা ৭·৪ জন। এই অল্পসংখ্যক লোককে শতকরা ৯২ জন লোকের অধীশ্বর করিতে হইবে কোন যুক্তির বলে? কিন্তু মজার কথা এই যে, কাশ্মীরকে তাঁহারা মুসলিম-রাষ্ট্রের অন্তর্গত করিতে চান। তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ—কাশ্মীরের লোকসংখ্যা অধিকাংশ মুসলমান। তাহার বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা হিন্দু হইলেও সে দেশকে মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে আনিতে হইবে। কিন্তু পাছে হিন্দুরা এই যুক্তি হায়দ্রাবাদে প্রয়োগ করিয়া তথাকার মুসলিম নিজামকে বিতাড়িত করিয়া দেয়, সেইজন্য হায়দ্রাবাদের বেলায় তাঁহাদের যুক্তি একেবারেই ভিন্ন ধরণের। তাঁহারা

বলেন, হায়দ্রাবাদে হিন্দুরা সংখ্যায় অধিক হইলেও, যেহেতু তাহার বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা মুসলমান, সেই হেতু উহাকে মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহারা বাটির ঝোলটাও চান, মাছটাও চান। কিন্তু হিন্দুরাও ত এই ধরণের যুক্তি দেখাইয়া কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ এই তুইটি প্রদেশকে হিন্দু-রাষ্ট্রের মধ্যে রাখিতে চাহিবে। ইহার উত্তরে পাকিস্থান পন্থীগণ কি বলিবেন? সেই জন্য বলিতেছিলাম, স্কীমের মধ্যে কোন সঙ্গতি নাই, কোন সদ্যুক্তি নাই। অনর্থক কোন্দল করিবার অভিসন্ধি ব্যতীত ইহাতে আর কিছুই নাই। এই স্কীমে মাইনরিটি সমস্যার সমাধানের কোন ব্যবস্থাই নাই। কারণ মুসলিম-রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক অমুসলমান মাইনরিটি স্থান পাইবে। ইহাতে বিহার প্রদেশের পূর্ণিয়াকে বাঙ্গলার সহিত সংযুক্ত করিবার ব্যবস্থা আছে। আর বাঙ্গলা দেশের প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগের কতিপয় জেলাকে কাটিয়া বিহারে সংযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাতে মাইনরিটি সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। সেই রক্ষা-কবচ, সেই বিশেষ সুবিধা, সেই অত্যাচার-অবিচার ও সন্দেহের কারণ থাকিয়া যাইবে। তাহাই যদি হয়, তবে সংযুক্ত ভারত হইতে ইহা কোন বিষয়ে উন্নত ও সুবিধাজনক হইবে? এই স্কীমে সমগ্র ভারতে কতকগুলি স্বাধীন (free cities) সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব আছে। কিন্তু এখানেও ত সেই মাইনরিটি ও মেজরিটির সমস্যা রহিবে। তাছাড়া ভারতের অধিকাংশ নগরে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অবশেষে তাহা হইলে এই হিন্দুদের হাতে কতকগুলি নগরের মুসলমানের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইবে!

অচল গণতন্ত্র কেমন করিয়া এই সব স্বাধীন নগরে সচল হইবে? গ্রন্থকারদ্বয় হিন্দু ও মুসলমানকে চেক ও সুডেটেন জার্ম্মানদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই সব স্বাধীন নগরকে ডানজিগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ভারতীয় চেক (মুসলমান) ও জার্ম্মান (হিন্দু)-দের মধ্যে আবার অধিকারের সীমারেখা লইয়া অহরহ সংগ্রাম হইতে পারে। কে বলিতে পারে যে, সেই সংগ্রাম ভারতময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে না? হিন্দুদের দূর্ব্যবহার ও মুসলিম বিরোধী নীতির ভয়েই যদি ভারত বণ্টন হয়, তবে বণ্টনের পর কি তাহা থামিয়া যাইবে? বিশেষ করিয়া যখন তাহারা নিজেদের রাষ্ট্রে মুসলমানকে পাইবে! হিন্দু ভারতের মুসলমানকে মাইনরিটি জাতি ও সমগ্র মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলে, হিন্দুরাও ত মুসলিম প্রধান প্রদেশের হিন্দুদের জন্য এই প্রকার দাবী করিবে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এই স্কীমে তাহাদের এই দাবীর কথা আদৌ স্বীকৃত হয় নাই। হিন্দু প্রদেশের পক্ষ হইতে একটা মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকিবে। কিন্তু মুসলিম প্রধান প্রদেশের হিন্দুদের জন্য সেরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় নাই। ইহার কারণ কি? তাহাদেরকেও ত এই ধরণের প্রতিষ্ঠান করিতে দিতে হইবে। তারপর যখন হিন্দুদের ও মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে, তখন এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বার্থ, সুবিধা ও অধিকার লইয়া অহরহ ঝগড়া, বিবাদ হইতে থাকিবে। আর সেই সুযোগে বিদেশী আসিয়া ভারতের ঘাড় মটকাইয়া রক্ত শোষণ করিতে থাকিবে। ভারত-বণ্টনের ইহাই পরিণতি। ইহার অন্য কোন পরিণতি নাই ও হইতেও পারে না।

৩। ডাক্তার লতিফের স্কীম

পাকিস্থান-আন্দোলনের সূচনার সময় ডাঃ আবদুল লতিফ একটি স্কীম রচনা করিয়াছিলেন। তাহা ঠিক পাকিস্থান নহে। ইহা ভারতবর্ষকে সংস্কৃতির ভিত্তিতে পুনর্গঠন করিতে চায়। ইহা একই সংস্কৃতি ভাবাপন্ন প্রদেশকে এক একটি কেন্দ্রে বিভক্ত করিয়া সমগ্র দেশকে একই ফেডারেশনের অধীনে আনিতে চায়। এই স্কীম অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষ চারিটি মুসলিম সাংস্কৃতিক অঞ্চল ও এগারটি হিন্দু সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত হইবে। ভারতের চারিদিকে যে সব দেশীয় রাজ্য আছে তাহাদিগকে তাহাদের স্বাভাবিক সামঞ্জস্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া এই সব সাংস্কৃতিক অঞ্চলে যোগ দিতে হইবে। প্রত্যেক অঞ্চলে একটি সম-জাতীয় রাষ্ট্র থাকিবে। এইগুলি আবার নিখিল ভারতীয় ফেডারেশনের সহিত যোগ দিবে। এই স্কীমে অধিবাসী বিনিময় অপরিহার্য্য। এক প্রদেশের লোককে অন্য প্রদেশে যাইতে হইবে। স্থানান্তরের সময় অনেক ক্ষেত্রে বহু দূরবর্ত্তী প্রদেশে তল্পী-তল্পা লইয়া যাইতে হইবে। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে বহু দেশীয় রাজ্যের লোককে ব্রিটিশ রাজ্যে এবং ব্রিটিশ রাজ্যের লোককে দেশীয় রাজ্যে আশ্রয় লইতে হইবে। কেন? একই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে বাস করিবার সুবিধা লাভের জন্য? এই অধিবাসী বিনিময়ের কার্য্য বহুদিন ধরিয়া চলিতে থাকিবে। কিন্তু অধিবাসী বিনিময়ের কথা ডাঃ লতিফ ভাল করিয়া চিন্তা করেন নাই। কলমের খোঁচাতেই যেন সব কাজ হইয়া যাইবে। কত অর্থব্যয় হইবে, কত অসুবিধা হইবে, ঘর বাড়ী নূতন করিয়া নির্ম্মাণ

করিতে হইবে, পুরাতন ঘর ছাড়িয়া নূতন ঘরে যাইতে হইবে। এই অধিবাসী বিনিময় পরে বাধ্যতামূলক হইবে। ইহা ভারতের দুই তৃতীয়াংশ লোককে মহা অসুবিধায় ফেলিয়া দিবে। কিন্তু তবুও কতকগুলি স্বপ্ন বিলাসী নেতার সাধ মিটাইবার জন্য ইহাই করিতে হইবে। ইহাই ভারতের ভাগ্য। এই স্কীমে দেশীয় রাজ্যগুলি তাহাদের বর্ত্তমান স্বেচ্ছাতন্ত্র চালাইতে থাকিবেন, এবং তাঁহাদের দায়িত্বহীন শাসকগণকে ব্রিটিশ ভারতের ফেডারেশনের অধীনে আনিতে চায়। ব্রিটিশ ভারতের কতক অংশ দেশীয় রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইবে। কিন্তু এই ব্রিটিশ ভারতের প্রজারা যে সামান্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা পাইয়া থাকে, তাহারা দেশীয় রাজ্যে গিয়া তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। তাহাদিগকে এ অধিকার দিবার কোন ব্যবস্থাই এই স্কীমে নাই। ডাঃ লতিফের স্কীমে পূর্ণ স্বাধীনতার নাম গন্ধ নাই। তাঁহার সমগ্র স্কীম কেবলমাত্র ১৯৩৫ সালের ভারত আইনকে কিছুটা সংশোধন করিতে অনুরোধ করিয়াছে। ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও ইসলামের নামে সমগ্র মুসলমান সমাজকে ধোকা দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ই এই স্কীমে নাই। ইহার বিস্তারিত সমালোচনা এই গ্রন্থের অন্যত্র আছে।

৪। সার সেকেন্দার হায়াতের স্কীম

সার সেকেন্দার হায়াত খাঁ একজন মডারেট মতাবলম্বী নেতা। কিন্তু তিনি লীগওয়ালাদের অবিমিশ্র সাম্প্রদায়িকতা পছন্দ করেন না। তিনি ভারতে ব্রিটিশের ছায়াতলকে নিরাপদ আশ্রয় বলিয়া মনে করেন। তিনি বিশ্বাস করিতে সম্মত নহেন যে, এদেশের সাম্প্রদায়িকতা ব্রিটিশ সরকারের ভেদনীতি

হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তাই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ যে সব ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেন, তিনি তদনুসারেই নিজের পলিসি গঠন করেন। কেবলমাত্র পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই যে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করেন না। ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য তিনি একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। তাহার প্রধান সর্ত্ত এই যে, ভারতকে ব্রিটেনের অধীনে থাকিতে হইবে। ১৯৩৫ সালের ভারত আইনকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার এই স্কীম বা পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। তাঁহার মতে সমগ্র ভারতবর্ষকে 'রিজনাল' (Regional) ভিত্তি বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভক্ত করিতে হইবে।

তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে সাতটি অঞ্চলে (বা Zone) বিভক্ত করিতে চান। সেগুলি একটি নিখিল ভারতীয় ফেডারেশনের অন্তর্গত হইয়া থাকিবে। তাঁহার প্রস্তাবিত Zone বা অঞ্চলগুলি এই ভাবে বিভক্ত হইবে :—

১ নং জোন—ইহাতে থাকিবে, আসাম, বাঙ্গলা, (পশ্চিম বাঙ্গলার একটি কি দুইটি জেলা ইহা হইতে বাদ যাইবে) এবং বাঙ্গলার দেশীয় রাজ্য ও সিকিম।

২ নং জোন—বিহার, উড়িষ্যা, বাঙ্গলা হইতে যে সব জেলা এই জোনে যাইবে সেগুলি।

৩ নং জোন—যুক্ত-প্রদেশ, এবং যুক্ত-প্রদেশের দেশীয় রাজ্য

৪ নং জোন—মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর এবং মাদ্রাজের দেশীয় রাজ্য ও কুর্গ।

৫ নং জোন—বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, পশ্চিম ভারতের দেশীয় রাজ্য, বোম্বাই অঞ্চলের দেশীয় রাজ্য, মহিসুর এবং মধ্য প্রদেশের দেশীয় রাজ্য।

৬ নং জোন—রাজপুতানা দেশীয় রাজ্য, (ইহা হইতে বিকানীর ও জায়-সালমার বাদ যাইবে), গোওয়ালিয়র, মধ্য ভারতের দেশীয় রাজ্য, বিহার ও উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য, মধ্য প্রদেশ এবং বেরার।

৭ নং জোন—পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্য, বেলুচিস্থান, বিকানির এবং জায়সালমার।

প্রস্তাবিত 'জোন' বা অঞ্চলগুলি পরীক্ষামূলকভাবে গঠিত হইবে। বিভিন্ন স্বার্থের সহিত পরামর্শ ক্রমে এগুলি পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

গঠন বিধি

(ক) প্রত্যেক 'জোন' বা অঞ্চলের জন্য একটি করিয়া আঞ্চলিক আইন পরিষদ থাকিবে। তাহাতে প্রত্যেক অঞ্চলের ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের ইউনিটের প্রতিনিধি থাকিবেন।

(খ) বিভিন্ন আঞ্চলিক আইন পরিষদগুলির প্রতিনিধিগণকে লইয়া সংযুক্ত ভাবে কেন্দ্রীয় ফেডারেল আইন পরিষদ গঠিত হইবে। ইহাতে ৩৭৬ জন সদস্য থাকিবেন। তন্মধ্যে ২৫০ জন ব্রিটিশ ভারতের এবং ১২৬ জন দেশীয় রাজ্যের হইবেন।

(গ) ফেডারেল আইন সভাতে মুসলমান সদস্য সংখ্যা হইবে মোট সদস্যের ১/৩ অংশ।

(ঘ) ১৯৩৫ সালের ভারত আইন ফেডারেল আইন পরিষদে অন্যান্য মাইনরিটি সম্প্রদায়ের জন্য যে আসনের ব্যবস্থা করিয়াছে ইহাতে তাহারা সেই আসন পাইবে।

(ঙ) ফেডারেল এক্সিকিউটিভের বড়কর্ত্তা হইবেন স্বয়ং বড় লাট। তিনি ভারত সম্রাটের প্রতিনিধিত্ব করিবেন। তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকিবে, তাঁহাদের সংখ্যা সাতের কম হইবে না, এবং এগার হইতে বেশী হইবে না। ফেডারেল প্রধান মন্ত্রী ইহাদের অন্তর্গত হইবেন না।

(চ) ফেডারেল প্রধান মন্ত্রী বড় লাট কর্ত্তৃক ফেডারেল আইন পরিষদের সদস্যগণ হইতে নিযুক্ত হইবেন। বাকী মন্ত্রীগণ, প্রধান মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া বড়লাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—

(১) প্রত্যেক জোন বা অঞ্চল হইতে অন্ততঃ পক্ষে একজন লোককে ক্যাবিনেটে আসন দিতে হইবে।

(২) এই সব মন্ত্রীদের মধ্য হইতে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ মুসলিম হইবে।

(৩) দেশীয় রাজ্য হইতে দুই কি তিন জন লোককে ক্যাবিনেটে লইতে হইবে।

(৪) অপরাপর মাইনরিটিগণের প্রতিনিধিবর্গকে ক্যাবিনেটে লইবার প্রত্যেক প্রকার চেষ্টা করিতে হইবে।

(৫) এই ফেডারেশন পরিকল্পনা গঠিত হইবার সময় হইতে প্রথম কুড়ি অথবা পনর বৎসর কাল পর্য্যন্ত বড় লাট দুইজন মন্ত্রীকে মনোনীত করিতে পারিবেন। তাঁহারা পরিষদের সদস্য হইতে পারেন, অথবা বাহিরের লোকও হইতে পারেন। তাঁহাদের হাতেই দেশরক্ষা ও বৈদেশিক ব্যাপারের ভার থাকিবে। তাহার পর হইতে সমস্ত মন্ত্রী কেবল আইন পরিষদ হইতে নিযুক্ত হইবেন।

মোটামুটি এইগুলি সার সেকেন্দার সাহেবের স্কীম। ইহা আর যাহাই হউক, ইহা পাকিস্থান নহে। মাইনরিটি রক্ষার উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা কোন উন্নততর প্রতিকারের পথ নাই। ক্যাবিনেট গঠনে সাম্প্রদায়িক হার থাকিলে ক্যাবিনেট সুপরিকল্পিত পন্থা অনুসরণ করিতে পারিবে না। এক মতাবলম্বী ক্যাবিনেটও হইবে না, বড় লাটের বর্ত্তমান পরামর্শ সভার মত মন্ত্রীরা ব্যক্তিগত দায়িত্বে কাজ করিবেন, যুক্ত-দায়িত্ব জন্মিতে পারিবে না। ফলে স্বায়ত্বশাসন একটা প্রহসন হইবে। এক ও অখণ্ড ভারতের কল্পনাই ইহাতে করা হইয়াছে। লীগপন্থীরা ইহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না। সর্ব্বাপেক্ষা ত্রুটি এই যে, ইহা স্বাধীন ভারতের কল্পনা মোটেই করিতে পারে নাই। ১৯৩৫ সনের ভারত আইনই ইহার মূল প্রেরণা-কেন্দ্র। ইহা দেশরক্ষা ও বৈদেশিক ব্যাপারকে সরাসরি ভারতবাসীর হাতে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। যতই রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা থাকুক না কেন, কেন্দ্রে মুসলমানগণ মাইনরিটি থাকিয়া যাইবে। পৃথক

নির্ব্বাচনর প্রথা থাকিবে বলিয়া মুসলমানের সহিত অমুসলমানের কোন সৌহৃদ্য জন্মিবে না। দেশীয় রাজ্যকে ব্রিটিশ ভারতের সহিত সংযুক্ত করিয়া এই স্কীম বহু গণ্ডগোল সৃষ্টি করিবে। দায়িত্ব ও দায়িত্বহীনতার সংমিশ্রণে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন খেলনার বস্তু হইয়া পড়িবে। ফলে ব্রিটিশ প্রভুত্ব ভারতে স্থায়ী হইয়া রহিবে। ইহার বিস্তারিত সমালোচনা এই গ্রন্থের অন্যত্র আছে।

৫। মুসলিম লীগের প্রস্তাব

মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে লাহোর অধিবেশনে ভারত বন্টনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবটিতে দাবী করা হইয়াছে :—

(১) ভৌগোলিক ভাবে সংলগ্ন অঞ্চলগুলিকে লইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন পূর্ব্বক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে। দরকার হইলে নিকটস্থ অঞ্চলকে ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া এমনভাবে গঠন করিতে হইবে যেন মুসলিম সংখ্যা-গুরু অঞ্চলকে একত্র করিয়া জাতীয় আবাসভূমি হিসাবে রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয়। এবং ঐ অঞ্চলসমূহ স্বায়ত্বশাসন ও পূর্ণ ক্ষমতাশীল রাষ্ট্র রূপে পরিণত হয়।

(২) এই সব বিভাগ ও অঞ্চল সমূহে সংখ্যা লঘুদের ধর্ম্মীয়, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, শাসনসংক্রান্ত এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য তাহাদের পরামর্শক্রমে শাসনতন্ত্রে উপযুক্ত কার্য্যকরী ও অবশ্য প্রতিপাল্য রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৩) ভারতের অন্যান্য যে সকল অংশে মুসলমানগণ সংখ্যা লঘু, সেখানে

তাহাদের এবং অন্যান্য সংখ্যা লঘুদের ধর্ম্মীয়, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, রাজনৈতিক শাসনসংক্রান্ত এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে শাসনতন্ত্রে উপযুক্ত কার্য্যকরী এবং অবশ্য প্রতিপাল্য রক্ষা-কবচের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত স্কীম সমূহের সমালোচনার সময় যে সব কথা বলিয়াছি, তাহার অধিকাংশই এই প্রস্তাবের বেলায় খাটিবে। মিষ্টার জিন্নার প্রধান ভীতি হইতেছে গণতন্ত্রকে। তিনি বলেন, ভারতে পশ্চিমের গণতন্ত্র চলিবে না। কিন্তু এই প্রস্তাবে সেই গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই প্রস্তাব অনুসারে যেরূপ স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র রচিত হইবে, সেইরূপ স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্রও গঠিত হইবে। আর এই দুই রাষ্ট্রে হিন্দুও থাকিবে, মুসলমানও থাকিবে। সুতরাং ইহাতে মাইনরিটি সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। আজ অখণ্ড ভারতে রক্ষা-কবচ যদি কার্য্যকরী না হয়, তাহা হইলে দ্বিখণ্ডিত ভারতেও তাহা হইবে না। বিভক্ত হইলে ভারতের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। প্রবল বিদেশী শক্তির পক্ষে ভারত আক্রমণ করা সহজ হইয়া পড়িবে। এই সব দিক বিবেচনা করিয়া আমরা লীগের এই প্রস্তাব আদৌ সমর্থন করি না। বরং ইহাকে অশেষ ক্ষতিকর মনে করি। এই ধরণের প্রস্তাব যতই হইতে থাকিবে, ততই ভারতবর্ষের পরাধীনতা স্থায়ী হইবে।

আজাদ মুসলিম দলের প্রস্তাব

এত সব নিরাশা ও অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন কতকগুলি জাতীয়তাবাদী মুসলমান। তাঁহারা স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ

হইয়া দেখিলেন যে, ভারত বণ্টনের সমস্ত পরিকল্পনা একটা অন্ধ মানসিকতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এগুলি পরাধীনতার নামান্তর মাত্র। তাই তাঁহারা দৃঢ় কণ্ঠে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করিলেন। গত ১৯৪১ সালের ৩০শে এপ্রিল সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লাহ বখশের সভাপতিত্বে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি-মূলক সভা বা কনফারেন্সে তাঁহারা এ সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রস্তাবটি ভারতের সমগ্র জাতীয়তাবাদী মুসলমানের জাতীয় প্রস্তাব। বহু চিন্তা ও আলোচনার পর ইহা পাকিস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। নিম্নে ইহার সারাংশ দেওয়া হইল :—

ভারতের যে সব মুসলমান দেশের জন্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতা কামনা করেন, বিভিন্ন প্রদেশের সেই সব মুসলমানের প্রতিনিধিগণ মুসলমানদের ও দেশের স্বার্থ সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা অত্যন্ত যত্ন সহকারে আলোচনা ও চিন্তা করিয়া ঘোষণা করিতেছেন :—

(১) ভারতবর্ষ তাহার সমুদয় ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমাসহ একটা অখণ্ড ও অবিভক্ত দেশ। এবং সেই জন্য সম্প্রদায়, বর্ণ, ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষ সকল শ্রেণীর লোকের মাতৃভূমি। সকলেই ইহার সম্পদের যুক্ত-মালিক।

(২) ভারতের সর্ব্বস্থানে ও প্রত্যেক অনুপরমাণুতে মুসলমানের ঘরবাড়ী ও নিজভূমি আছে। তাহার অতিপ্রিয় ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক নিদর্শন সমূহ দ্বারা ভারতের প্রত্যেক অঞ্চল গৌরবান্বিত। এগুলি তাহার নিকট প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বস্তু।

(৩) জাতীয়তার দিক হইতে ভারতের প্রত্যেক মুসলমান ভারতবাসী। এই দেশের সমস্ত অধিবাসীদের সাধারণ অধিকার ও স্বার্থসমূহে মুসলমানের সমান অধিকার আছে। তাহাদের জীবনের প্রতিপদক্ষেপে ও তাহাদের কর্ম্মের প্রতি কেন্দ্রে তাহাদের দায়িত্ব অপরাপর সম্প্রদায়ের সমান।

(৪) তাহাদের এই অধিকার ও দায়িত্ব বশতঃ ভারতের মুসলমানগণ নিঃসন্দেহ ভাবে ভারতীয় জাতির অন্তর্গত। সরকারী, আর্থিক, ও অন্যান্য জাতীয় বিষয়ে সুবিধা ও অধিকারে অপরাপর ভারতীয়দের সহিত প্রত্যেক অঞ্চলের উপর মুসলমানের সমান অধিকার ও সমান স্বত্ব আছে। এই হেতু দেশের স্বাধীনতা পাইবার জন্য সংগ্রাম ও আত্ম-ত্যাগের ব্যাপারে দেশের প্রতি মুসলমানের সমান দায়িত্ব আছে। ইহা এত স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, কোন দায়িত্ববোধসম্পন্ন ও চিন্তাশীল মুসলমান তাহা অস্বীকার করিতে পারে না।

(৫) এই সমিতি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এবং দৃঢ়তা সহকারে ঘোষণা করিতেছে যে, মুসলমানের লক্ষ্য তাহাদের ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়গত স্বার্থ রক্ষণসহ পূর্ণ স্বাধীনতা। যত শীঘ্র সম্ভব এই লক্ষ্যে পহুঁছিবার জন্য তাহারা ব্যগ্র হইয়াছে। এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অতীতে তাহারা অসীম ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে।

(৬) ব্রিটিশের অনুচরগণ ও সেই শ্রেণীর লোকগণ মুসলমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার পথে বাধাস্বরূপ—এই সভা অকুণ্ঠিত ভাবে ও দৃঢ়তা সহকারে সে অভিযোগ অস্বীকার করিতেছে, এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছে যে, মুসলমানগণ তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে

সম্পূর্ণ সজাগ। এই অভিযোগ তাহাদের আদর্শের বিরোধী, তাহাদের সম্মানের পক্ষে অপমানজনক। অপর কোন সম্প্রদায় হইতে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে তাহারা কোনভাবেই পশ্চাতে নাই।

এই প্রস্তাব হইতে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইতেছে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ স্বাধীনতার জন্য অতীব ব্যগ্র। তাঁহারা ভারতকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করিতে সম্মত নহেন ; এবং তাঁহারা স্বাধীনতার নামে সত্যিকারের মুসলমান স্বার্থ বলিদান করিতেও প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা জাতীয়তাবাদী এবং ভারতের অখণ্ডত্বে পূর্ণ বিশ্বাসী। মুসলমানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ভাগ্য অপরাপর ভারতীয়দের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত। সুতরাং মুসলমানের কল্যাণ করিতে হইলে সকলের সহিত মিলিত হইয়া একই ক্ষেত্রে তাহা করিতে হইবে। অখণ্ড ভারতে একই আসন-তলে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে দেশের ও সমাজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

পরলোকগত মৌলানা মোহম্মদ আলী কোকনদ কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রসঙ্গে যে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান পাকিস্থান পরিকল্পনা সম্পর্কে সমানভাবেই প্রযোজ্য হইতে পারে। তাই তাঁহার কথায় এই পুস্তকের উপসংহার করিতেছি। তিনি বলেন :—

" . . . *Really I never believed in that Partition. Only I ask you to realise the fact that this Government had to call upon the Moslems to fight as its auxiliaries against the*

Hindus in Bengal. Undoubtedly the Partition of Bengal was most unjust and carried in the most vindictive spirit of Lord Curzon ;—yet when the Government found that things were getting too hot for it, it dropped the Muslims like a hot potato. Never was a more ignoble betrayal perpetuated in the whole history of Indian politics. Nothing could have more clearly convinced them that their dependence upon a foreign Government for support as against sister communities, laid them perpetually open to such betrayals. They now realise that they could place no reliance on such support whether at home or abroad, and it set them thinking that perhaps at a much smaller sacrifice of their interests they could purchase lasting peace and even secure the friendship of their neighbours and fellowcountrymen."

(*Presidential Speech at Coconada Congress 1923*)